শ্রী রা ম কৃ ষ্ণা য় ন

মাখন গুপ্ত

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা-২৯ | কলিকাতা-৯

SRI RAMKRIṢHNAYAN

by Makhan Gupta

প্রথম প্রকাশ :
জন্মাষ্টমী
১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জি জ্ঞা সা
১৩৩ এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯ ;
১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

পিতা বিশ্বেশ্বর গুপ্ত

ও

মাতা নীরদাসুন্দরী গুপ্তার

স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে—

বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীমাখন গুপ্ত মহাশয় স্বভাবকবি, আপন অন্তরের কাব্যের সুধানিঃসৃত ধারায় তিনি পরিপ্লুত। এ পর্যন্ত তিনি পাঠক-সমাজের কাছে নিবেদন করেছেন 'মহাজীবন', 'হে বীর পূর্ণ কর', 'সারথি', 'বেদনবীণা' প্রভৃতি গীতিমুখ্য কাব্যগ্রন্থগুলি। খাঁটি বাংলা কবিতার স্বাদ আজ আমরা ভুলতে বসেছি, বিশেষত শ্রোতার আসরে সুমহান আদর্শ-সমন্বিত কাব্যরস পরিবেষণ আজ আর ঘটে না। কিন্তু এই কবির কাব্যসঙ্গীতের ধারায় এবং কথকতার সূত্রে শ্রোতৃসমাজে অবলীলাক্রমে নিবেদন করা যায়, এ-ধরনের পরিবেষণা বহু জায়গায় হয়েছে। কবির গান অনেকেই গাইছেন, অবশ্য কবিকে স্বীকৃতি না দিয়েই।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে লেখক কথকতার সম্মোহিনী ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকথা গ্রথিত করেছেন, উপযুক্ত পরিবেশ রচনার দ্বারা ভাবঘন সঙ্গীত সংস্থাপন করে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে পাঠকসমাজের মানস চক্ষে প্রতিভাত করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণায়ন

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে ।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ।।

নমো রামকৃষ্ণায়

তুমি কি রবে ভুলে ?
আমি কি যাব সাথী
শুধুই মালা গাঁথি,
কামনা তরুমূলে, বেদনা ফুলে ফুলে ।
যতনে ফুলমালা গেঁথেছি যতবার,
তোমার পূজাতরে অর্ঘ্য উপচার,
হেলায় অগোচরে বুঝি তা যায় ঝরে—
হৃদয়ে সদা ভয়-ভাবনা অনিবার ।
যেদিকে চাই, হেরি পাষাণ কারাগার,
বিষের ধোঁয়া চোখে উথলে হাহাকার,
নিখিলে পাতি কান যখনই শুনি গান
কাঁদিয়া ওঠে প্রাণ সুরের ঢেউ তুলে ।
মেঘের পানে চাহি পিপাসা মরে দহি
শিকল গুরুভার কেমনে যাই খুলে ।

*

কোথা তুমি তপোধন,
মন্দিরে হেরি শূন্য আসন
কাঁদে যোগীজনমন ।

শ্রীরামকৃষ্ণায়ন

দ্বাদশ শিবের মন্দির ছুঁয়ে
বহে জাহ্নবীধারা—
মৃন্ময়ী যেথা চিন্ময়ী হয়ে
অন্তরে দিল সাড়া।
পূজারী হইয়ে মা মা বলে,
চরণ ধোয়ালে নয়নের জলে,
পাষাণের বুকে স্পন্দন জাগি
উজলিল এ ভুবন।
পঞ্চবটীর শ্যামল ছায়ায়,
মুখে মা মা বুলি ধূলামাখা গায়,
প্রেমের ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগন।
হে কল্পতরু! প্রেমের খেলায়
সবারে ডাকিলে 'আয় চলে আয়'।
আসে দলে দলে খেয়া দিয়ে নায়
সন্তান অগণন।
কথা-অমৃতে জুড়াল শ্রবণ
কত সাধু সুধী জন।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ (২৫।৩৮)—

হিমালয় ও মহাসাগর-বেষ্টিত প্রকৃতির রম্য পরিবেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ক্রমবিকাশের ধারায় আধ্যাত্মিক মহাভাবে চিরসমৃদ্ধ। মহান এই সংস্কৃতির ধারক আর্যঋষিরা; যোগসাধনার বলে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার, ভূমির সঙ্গে ভূমার। সৃষ্টি করেছেন বেদ-উপনিষদ, মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত। স্বচ্ছ প্রজ্ঞা ও দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভাষায়, 'এই সেই ভারত—যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ ও শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্য্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে—এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য্য ও অমর জীবন লইয়া ভূপৃষ্ঠের যে-কোন পর্ব্বত অপেক্ষাও অটলভাবে দণ্ডায়মান।' পরবর্তী কালে ইতিহাসের ধারা কালসমুদ্রে বিলীন হলেও এই মহান সংস্কৃতি কালজয়ী শাশ্বত, ভাস্কর তেজে পৃথিবীর বুকে অনন্ত যুগ ধরে প্রদীপ্ত। যতবার মসীলিপ্ত ও রাহুকবলিত হয়েছে, ততবারই ঐশী মহাশক্তির আবির্ভাবে ও প্রভাবে রাহুমুক্ত হয়েছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই ইংরাজ-রাজের রাজসিংহাসন ভারতের মাটিতে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠাবান ঘরের ছেলে ও যুবসম্প্রদায় সাহেবিয়ানার ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেছে; অন্যদিকে দেশের নব্বই শতাংশ নিরক্ষর, নিরন্ন অবস্থায় অন্ধ

কুসংস্কারের আস্তাকুঁড়ে নিমজ্জিত। এই হতভাগ্যদের সঙ্গে মিলেমিশে একজাতিত্বের পরিচয় দিতে পূর্বোক্ত শিক্ষিত সমাজ সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। পরাধীনতার নাগপাশে অবরুদ্ধ দেশের ধ্বংসের এই গতিবেগ রোধ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথমে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলার মনীষী সন্তান মহাতেজা রাজা রামমোহন রায়। ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে এলেন রামমোহনের অনুগামী পরমনিষ্ঠ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, এলেন মানবদরদী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জ্ঞান ও ভক্তির মূর্ত প্রতীক কেশবচন্দ্র, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। এঁরা সকলেই এক এক ধারার মহান পুরুষ এবং এঁদের সমসাময়িক কালেই ভক্তির নব মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করেছিলেন যিনি, বেদান্ত সংস্কৃতির নবরূপ—সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবধর্মের বিজয়কেতন উড়িয়েছিলেন যিনি, তিনি অতি দীন, গ্রাম্য পরিবেশের দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আর তিনিই একদিন এই দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে এসে যোগ-তপস্যাবলে সিদ্ধি লাভ করে সারা ভারতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রূপে সুপরিচিত হয়েছেন। আজ তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রণম্য।

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, ভক্তি ও ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে জগতে এসেছিলেন এই মঙ্গলময় মহাপুরুষ। একমাত্র বিশ্বাস ও অসাধারণ ভক্তি যোগসাধনার বলে এই মহাসাধককে করেছিল পরম জ্ঞানের অধিকারী, নিষ্কাম জ্যোতির্ময় সিদ্ধপুরুষ পরমহংস। কালের গতিতে এই মহাপুরুষের যখন তিরোধান হয় তখন তাঁর ধ্যানলব্ধ জ্ঞান অগ্নিমন্ত্রে মূর্ত হয়ে ওঠে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব জ্ঞান ও কর্মসাধনায়। সে পরবর্তী কালের আর এক মহা অধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব দিবস বাংলা ১২৪২ সালের ৬ ফাল্গুন বুধবার, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ। গ্রামের নাম কামারপুকুর, জিলা হুগলী। পিতামাতা দুজনেই ছিলেন ঈশ্বরভক্ত পরম ধার্মিক—নাম ক্ষুদিরাম

চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণি দেবী। ক্ষুদিরামের তিন পুত্র ও দুই কন্যা। নাম যথাক্রমে—রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, কাত্যায়নী দেবী, রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, গদাধর চট্টোপাধ্যায় ও সর্বমঙ্গলা দেবী। শ্রীরামকৃষ্ণেরই পিতৃদত্ত নাম গদাধর—গদাই বলে গ্রামের সর্বত্র পরিচিত।

পাঁচ বছর বয়সে গদাইর হল হাতে খড়ি অর্থাৎ বিদ্যারম্ভ। বিদ্যারম্ভে সামান্য কিছু লেখাপড়া শেখার পর পড়ায় আর তাঁর মন বসল না, মন বসল তাঁর নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়ায়, সংকীর্তনে, কথকতায়, যাত্রায় ও নানাবিধ ঐশী প্রসঙ্গে। মাত্র সাত বছর বয়সে নিতান্ত বাল্যকালে গদাধরের হল পিতৃবিয়োগ। ক্ষুদিরাম তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কাত্যায়নীর বাড়ীতে পুজা উপলক্ষে বেড়াতে গিয়ে মাত্র অল্প ক'দিন রোগভোগের পর শেষ নিশ্বাস সেখানেই ত্যাগ করলেন।

তারপর ন' বছর বয়সে উপনয়ন হওয়ার পর গৃহদেবতা রঘুবীরের নিত্যপূজা ও সেবার ভার অর্পিত হল গদাধরের উপর। সত্যের মূর্ত প্রতীক রঘুবীরের সেবায় ব্রতী হওয়ার পূর্বে নিতান্ত বালক হয়েও সত্যে অবিচল নিষ্ঠার জ্বলন্ত প্রমাণ দিলেন গদাধর তাঁর জন্মক্ষণের ধাত্রী ও শৈশবের পালয়িত্রী ধনীর নিকট হতে উপনয়নের সময় ভিক্ষা গ্রহণ করে। ধনী ছিলেন কামারপুকুরের অব্রাহ্মণ সহায়সম্বলহীনা অপুত্রক এক বিধবা রমণী। পুত্রস্নেহে আশৈশব গদাধরকে লালনপালন করেছেন। গদাইর কাছে শুধুমাত্র এইটুকু ছিল দাবি যে, গদাই উপনয়নের সময় যেন মা বলে তাঁকে ডেকে তাঁর কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে নেয়। দাদা রামকুমারের বাধাদান সত্ত্বেও ধনীর এ সাধ তিনি পূর্ণ করেছিলেন। ধনী অব্রাহ্মণ বলে রামকুমারের ছিল আপত্তি। গদাধর এই বলে তা খণ্ডন করলেন, 'দাদা, সত্যরূপী রঘুবীর রামচন্দ্র আমাদের গৃহদেবতা, সত্যের স্থান জাতিবিচারের অনেক উর্ধ্বে, তাছাড়া ধনীও আমার আর একজন মা'। গদাধরের প্রজ্ঞা ও যুক্তি রামকুমারের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল, আর তিনি আপত্তি তুললেন না।

অতি শৈশব থেকেই ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণের ন্যায় ঐশী

ভাবে ভরপুর ছিল তাঁর হৃদয়। ছ' বছর মাত্র যখন তাঁর বয়স তখন আঁচলে কিছু মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মেঠো পথ দিয়ে আপন মনে হেঁটে চলেছেন, একটু পরে দেখতে পেলেন মাথার উপর একখণ্ড ছোট মেঘ, চোখের নিমেষে চারদিকে তা ছড়িয়ে গেল, আর তা লক্ষ্য করে এক ঝাঁক বক তীরবেগে ছুটে এসে সেই মেঘের মাঝে একসঙ্গে মিলিয়ে গেল। বালক গদাধর একমনে ওদিকে চেয়ে থেকে শেষে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন মাঠের ধূলায়। এক প্রতিবেশী দেখতে পেয়ে কোলে তুলে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। একটু পরেই চৈতন্য ফিরে এল, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিষাদে ভরে উঠল মা ও দাদাদের মন।

গদাধরের বড়-দা রামকুমার সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সংসারে নিত্য অভাব-অনটন লেগেই আছে, তাই উপায়ের আশায় শেষে গ্রাম ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। কিছু সংখ্যক ছাত্র সংগ্রহ করে ঝামাপুকুরে খুললেন এক চতুষ্পাঠী।

আর গদাধর বাড়ীতে তখন যাত্রা, কথকতা ও কীর্তনে আরও অধিক মেতে উঠলেন। সাধুদের কাছে গিয়ে অথবা তাঁদের ডেকে এনে একমনে বসে তাঁদের মুখ থেকে যে সব ধর্মতত্ত্ব শুনতেন হৃদয়ে সে সব গাঁথা হয়ে থাকত। গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলকে ডেকে আসর জমিয়ে অতি উৎসাহে সকলকে তা শুনিয়ে দিতেন।

সেদিন কামারপুকুর গ্রামের শীতল শ্যামলকুঞ্জছায়াঘন এক বটগাছের তলে বসেছে গদাধরের কথকতার আসর। গদাধর কথক, আর কিছু বালকবালিকা সহ ক'জন ধর্মপরায়ণা মহিলা হলেন অবাক শ্রোতার দল। এসব কথকতা ক'দিন আগে তিনি শুনেছিলেন গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ীতে বসে। বচনে আর অঙ্গভঙ্গীতে অবিকল কথক ঠাকুরের সম্পূর্ণ অনুকরণ। একবার মাত্র শুনে সেই কথকতার ভাব ও ভাষা হৃদয়ে গাঁথা হয়ে গেছে।

'ঐ যে অসীম কালিমালিপ্ত মহাকাল সমুদ্র, বিশাল তার বক্ষ

জুড়ে অনন্ত যুগ যুগ ধরে প্রদীপ্ত সূর্য। আরও উর্ধ্বে কোটি কোটি নক্ষত্রলোক মহাকর্ষণে তাদের বেষ্টন করে অবিশ্রাম গতিতে ছুটে চলেছে আরও কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ, নিরন্তর সর্বত্র সেখানে আলো অন্ধকারের খেলা, আমরা যাকে বলি দিন ও রাত্রি। আবার তাদেরই ঘূর্ণাবর্তে জীবজগতের জীবন-মৃত্যুর গোপন রহস্যময় ধারা, এখন এই যে জগৎ এবং জাগতিক দৈনন্দিন লীলা—প্রকৃত উৎস এর কোথায়? তর্ক ও বিচার, বিজ্ঞান ও দর্শন; ঠিক একটি বিন্দুতে এসে তর্কের অবকাশ আর না রেখে গঙ্গাযমুনার মত মিলে গেছে অদৃশ্য একক মহাশক্তি। এখন তুমি আমি আমাদের চিন্তা ও ধ্যানলব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির বিচারে এই মহাশক্তিকে সগুণ ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চৈতন্যময়ী কালী অথবা দশদিকে দশহস্ত প্রসারিত দুর্গাই বলি, বাহির অনন্তে আর জীবজগতের জীবের অন্তরে সেই এক মহাশক্তিই কাজ করে চলেছে। তাতেই বিশ্ব ও প্রকৃতি—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়।'

নমো নমো নমঃ পুরুষ পরম,
বিশ্ব অনাদি হে পিতা।
তব প্রেম রূপ মহিমা প্রকাশে
আকাশে উদয় সবিতা।
করি অনন্ত যুগ সাধনা,
সাজি নানা সাজে আপনার মাঝে,
বিশ্ব করেছ রচনা।
অনুরাগে রাঙি পরমা প্রকৃতি
প্রেমভরে পদে নমিতা।
সকল রাগিণী আপন বীণার
একতারে লয়ে বাঁধিয়া,
বাজাইছ গান এক লয় তান—
শুনে প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া।

ঝঙ্কারি ওঠে বিশ্ব কণ্ঠে
বেদান্ত গীত সংহিতা।

ক'দিন আগে গ্রামে কৃষ্ণলীলা যাত্রা হয়েছে। গদাধরের খেলার আসরে আজ আবার সেই যাত্রার পালা। শুনতে এসেছেন চন্দ্রমণি, ধনী, গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ী ও অন্যান্য ধর্মপ্রাণা মহিলারা। ভক্ত বালকের এই খেলা দেখে আনন্দ ও ভক্তিতে তাঁরা অভিভূত হন। এছাড়া খেলার সাথী অন্যান্য ছেলেরা তো আছেই।

গদাধর রাধার সাজে সেজে আসরে প্রবেশ করেন, কৃষ্ণ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ধারায় নেমে এসেছে দু'চোখের জল।

'হায় নিষ্ঠুর, যমুনার পরপারে মথুরায় আজ তুমি রাজা—আর বৃন্দাবন ঘিরে নিবিড় অন্ধকার। এই যদি তোমার মনে ছিল তবে কেন, কেন আমাকে তুমি তোমার রূপের হাটে টেনে বের করে এনে আমার একূল ওকূল দু'কূল ডুবিয়ে দিয়ে, অকূলে শেষে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলে? আমাকে যে ভুলে গেল, কেন আমি তাকে ভুলতে পারি না? কেন কৃষ্ণ নাম মনে হলে, বুকের কান্না আকুলিবিকুলি ঢেউ তুলে যমুনার তীরে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

পা-পা চলি ঐ যমুনার জলে রে
তু' কোথা প্রাণ-বাঁশরিয়ারে।
আর, তমাল তরুতলে যমুনা কিনারে
বাজে না বাঁশরি প্রেম অভিসারে!
ঘন শ্যামল তৃণ-দল
কাল কাজল জল,
—আছ কেমনে পাশরিয়া রে।
আজ আকাশে গুরু গুরু, সজল মেঘভার;
হৃদয়ে দুরু দুরু আঁধার চারিধার।

কাঁদে ব্রজের নাগরী, ভাসায়ে গাগরী,
—না হেরি কিশোরিয়া রে।

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঝোরঝরা চোখের ধারা প্রেম ও ভাবের অথৈ সমুদ্রে পলকে বালককে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

'কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় তুমি'—বলে চেতনা হারিয়ে বালক লুটিয়ে পড়লেন সেই খেলার আসরে।

'কি হল, কি হল'—একসঙ্গে তখন সবাই মিলে 'ধর ধর' বলে চিৎকার। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর ভাবসমাধির যখন অবসান, গ্রামের সূর্য অস্তাচলে তখন সন্ধ্যার কোলে ঢলে পড়েছে। হাল্‌কা অন্ধকারের অবগুণ্ঠন তলে, দেবদেউলে বেজে উঠেছে আরতির কাঁসর ঘণ্টা। কিন্তু বালকের নয়নযুগল তখনও ভাবে ঢল ঢল—চারদিকে কার যেন অনুসন্ধানে রত!

আঁধার করে পালিয়ে গেলে
কোন্ সাগরেব তীরে।
তোমার কাল রূপে মজিয়ে আমায়
ভিজিয়ে আঁখিনীরে।
আমার কালকে আবার রাত পোহাবে
তোমার বাঁশির সুরে।
তোমার রূপের ঝরণারাশি
ফুলের মত লুটব হাসি,
অবাক চোখে থাকব চেয়ে
তোমার আকাশ পানে।
তোমার মাঝে করে খেলা,
কাটবে আমার সারা বেলা,

সন্ধ্যা যখন আবার তখন
মিলিয়ে যেও ধীরে।
তোমার কাল রূপে মজিয়ে আমায়
ভিজায়ে আঁখিনীরে।

কামারপুকুরে সীতারাম পাইনের বাড়ীর উঠানে আজ বসবে নামকরা এক যাত্রার দলের আসর। উপলক্ষ শিবরাত্রি, আবার পালার নামও 'শিবরাত্রি'—সময় রাত্রি দশটা—তাই গ্রামের ছেলেবুড়ো সবার প্রাণে আজ অপার আনন্দ। সহসা শোনা গেল, শিবের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করে থাকেন, প্রবল জ্বরে সহসা তিনি পীড়িত। অধিকারীর চোখ মুখ দুর্ভাবনায় ছানাবড়া—'এখন উপায়? বায়না নিয়েছি, ছোকরাদের মারের হাত থেকে পিঠ বাঁচাই কেমন করে? বাবা শিব, তারকনাথ! এ বিপদের হাত থেকে স্বয়ং তুমি এসে আমাকে উদ্ধার কর।' চোখ দু'টো চরকির মত ভয়ে চারদিকে কেবল ঘুরছে। এমন সময় একদল ছেলে গদাইকে নিয়ে অধিকারীর সম্মুখে হাজির। গদাইকে দেখিয়ে বললে, 'এর নাম গদাধর, ভাল অভিনয় করে, যে সব কথা বলতে হবে ভাল করে শিখিয়ে দিন, তারপর যাত্রা আরম্ভ হক।'

উপবাসী গদাধর শিবের পূজা সেরে, সবেমাত্র শিবের ধ্যানে বসেছিলেন; এমন সময় এই ছেলেরা গদাধরকে ধরে নিয়ে এসেছে।

অধিকারীর ধড়ে প্রাণ এল; শিব শিব বলে কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে, গদাধরের দিকে চেয়ে ভাবলেন, বেশ দেখতে ছেলেটি—ভাল করে শিখিয়ে দিলে নিশ্চয় ভাল অভিনয় করবে।

যথাসময়ে শুরু হল যাত্রা। হাতে ত্রিশূল, গদাধরের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তার মনভুলানো ভুবনমোহন রূপ দেখে একসঙ্গে বার বার শিব শিব বলে সকলের হাততালি। ভাবে সমাহিত গদাধর, কিন্তু দৃঢ় হস্তে ত্রিশূল ধারণ করে পাথরের সুঠাম মূর্তির মত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। বাহ্যজ্ঞান অবলুপ্ত, ধারায় নেমে এসেছে দু' চোখের জল।

সবাই বলাবলি করছে, কৈলাসের শিব ওতে মূর্ত হয়েছে, না হলে এত সুন্দর দেখতে হয়! এক বুড়ো চিৎকার করে বললেন, 'ওরে শিবরাত্রির পুণ্য দিনে তোরা সবাই আজ গদাইকে দেখ ভাল করে'—ও যেন সত্যই স্বয়ং শিব।

আজি এ আসরে বুঝি নটরাজ
ভব পাপতাপহারী।
বুঝি কৈলাস ছাড়ি, এল ত্রিপুরারি
—স্বয়ং ত্রিশূলধারী।

শিরে জটাজাল গলে বিষধর,
ললাটে নেত্র আঁকা।
রুদ্রাক্ষের মালা আভরণ
অঙ্গে বিভূতিমাখা।
ভাবে সমাহিত আঁখি পল্লবে—
ঢল ঢল প্রেম বারি।

সুন্দর ঠাম নয়নাভিরাম,
নাম প্রেমরসে ভাসে অবিরাম,
জপি বার বার শিব শিব নাম
চেতনা গিয়েছে ছাড়ি।

'আজ শিবরাত্রির পুণ্যদিন, তাতে গদাই আবার আমাদের সদাই ভক্তিতে গদগদ।' কথাগুলি একটার পর একটা কানে যেতেই অধিকারী এই বলে ভক্তিতে গদাধরের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন, 'বাবা, অনেক পাপ করেছি, আমাকে ঐ পাপতাপ থেকে উদ্ধার কর —আমাকে মুক্ত কর।'

রাত্রি এইভাবে কেটে গেল—পরদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঘটল এই ভাবসমাধির অবসান।

দেবতাজ্ঞানে গদাধরকে ভক্তি ও মনে মনে পূজা করতেন কামারপুকুরের অনেক ধর্মনিষ্ঠা মহিলা। জমিদার ধর্মদাস লাহার মেয়ে প্রসন্নময়ীর দেবদেউলে গমনাগমনের তিনি ছিলেন প্রত্যহের সহযাত্রী। পূর্ণ সতের বছর পর্যন্ত ভক্তির আবেগে যাত্রায়, কথকতায়, কীর্তনে সকলের অন্তর মাতিয়ে তুলে সহসা একদিন দাদা রামকুমারের নির্দেশে কামারপুকুরকে কাঁদিয়ে কলকাতার ঝামাপুকুরে চলে এলেন। সবার চোখে জল—এ যেন ব্রজপুরী অন্ধকার করে সেই চিরশ্যামল ব্রজকিশোরের যমুনার পরপারে মথুরায় যাত্রা। উদ্দেশ্য দাদার কাছে থেকে এখন ভাল করে মন দিয়ে লেখাপড়া শেখা, দু'বছর দাদার কাছে থেকেও কিন্তু গদাধরের পুরাতন মতিগতির কিছুমাত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল না। কীর্তনের আসরে ক'দিনের মধ্যেই গদাধরের ডাক এল। রামকুমার ভাইয়ের ভাব দেখে বিষণ্ণ। শেষে বিরক্ত হয়ে একদিন ডেকে বললেন, 'লেখাপড়ায় এখনও একটু মন বসা; কিছু না শিখলে দু'পয়সা রোজগার হবে কি করে?' উত্তরে গদাধর বললেন, 'বাড়ী বাড়ী ঘুরে চালকলা কুড়োবার বিদ্যা শিখতে আমি পারব না'। ঠিক এই সময়টিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শাস্ত্রীয় পাতি চেয়ে জানবাজারের রানী রাসমণির কাছ থেকে রামকুমারের কাছে এল বিশেষ জরুরি এক চিঠি।

জানবাজারের ধনী জমিদার রামচন্দ্র দাসের সহধর্মিণী রানী রাসমণি তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে নৌকায় কাশীধামে যাত্রা করলেন, কিন্তু ঘুমের ঘোরে নৌকায় রাত্রিতে দেখলেন এক পরমাশ্চর্য স্বপ্ন। স্বয়ং মা ভবতারিণী কালী ডেকে তাঁকে বলছেন, 'যা বলি তা মন দিয়ে শোন্। কোথাও তীর্থে তোর যেতে হবে না। সর্বত্র আমি আছি। নিজের অন্তর শুদ্ধ ও পবিত্র করে ভক্তিভরে এই গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠা কর আমার

মন্দির। অনন্ত যুগ ধরে অধিষ্ঠাত্রী হয়ে থাকব আমি তোর সেই পবিত্র মন্দিরে। অদূর ভবিষ্যতে তোর প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দির হবে জগতের এক মহাতীর্থপীঠ। জগতের বুকে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হয়ে থাকবে চিরকাল তোর এই মহান কীর্তি—আর তার সঙ্গে তোর নাম ও পবিত্র স্মৃতি।' রোমাঞ্চিত হয়ে চমকে উঠে, ভেঙে গেল রানীর ঘুম। তখনই ত্যাগ করলেন তীর্থভ্রমণের সংকল্প। অটল হলেন ভবতারিণীর মন্দির-প্রতিষ্ঠার সংকল্পে। মাঝিদের ডেকে বললেন, 'কলকাতার দিকে নৌকা ভিড়াও, কোথাও আর যাওয়া হবে না'।

তারপর চেষ্টা করে অত্যল্প দিনের মধ্যেই ষাট বিঘা জমি কিনলেন দক্ষিণেশ্বরে। পরিকল্পনামত সমস্ত মন্দিরগুলি তৈরি হতে খরচ হল নয় লক্ষ টাকা। কিন্তু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাব্রতে শাস্ত্র ঘেঁটে বাধা দিতে এগিয়ে এলেন ব্রাহ্মণেরা। সমবেত কণ্ঠে তাঁরা ঘোষণা করলেন, 'না-না কিছুতেই এ হতে পারে না।—হলেনই বা তিনি রানী, কিন্তু এ কথা তো মিথ্যে নয়—রানী হলেও তিনি শূদ্রাণী।' এই মহাকাজে এমত মন্তব্য শোনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। নিরুপায় হয়ে কেঁদে কেঁদে তিনি মাকে ডেকে বললেন, 'মা আমি শূদ্রাণী, অতি সত্য কথা, কিন্তু এ আদেশ তো তোমার! মন্দির তৈরি হয়েছে, এখন সেখানে তোমাকে অধিষ্ঠিতা করার সহজ পথ ও উপায় তুমিই তাহলে বাতলে দাও।' ভেবে ভেবে রানীর যখন আহারনিদ্রা একেবারে সম্পূর্ণ বন্ধ তখন রামকুমারের পাতি সহসা এসে একদিন উপস্থিত। তাতে লেখা রয়েছে, 'মন্দিরের বিগ্রহের পূজা ও পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সম্পত্তি ও মন্দির যদি কোনও ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গ করা হয়, তবেই মন্দিরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় যোগদান করে শাস্ত্রমতে পূজান্তে ব্রাহ্মণেরা বিগ্রহের প্রসাদ-অন্ন গ্রহণ করতে পারেন। পাতি পড়ে রানী ভক্তিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে মাকে জানালেন অসংখ্য প্রণাম। ভাবনার অকূল সমুদ্রে পড়ে অতি সহজেই তিনি ত্রাণ পেলেন; অচিরেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তারপর রানীর অনুরোধে

রামকুমারই পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হয়ে গ্রহণ করলেন এই মহৎ কাজের সম্পূর্ণ গুরুভার দায়িত্ব।

রানী রাসমণি ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় একটি নাম। পর পর চার কন্যার যখন তিনি জননী স্বামী রামচন্দ্র দাস তখন ইহধাম ত্যাগ করলেন। অতি উৎসাহে স্বামীর জীবিতাবস্থায় তাঁর কাছেই শিখেছিলেন লেখাপড়া ও জমিদারি পরিচালনার সব রকম কলাকৌশল। স্বামীর অবর্তমানে তাঁর কর্মকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় বছর বছর জমিদারির আয় ক্রমবর্ধমান হল। জনকল্যাণ, সমাজসেবা ও ধর্মীয় নানাবিধ কাজে অকাতরে তিনি চিরকালই বহু অর্থ ব্যয় করে গিয়েছেন। একে একে তিন কন্যার বিয়ে হল। রানীর তৃতীয় জামাতার নাম মথুরামোহন বিশ্বাস; সেকালের হিন্দু কলেজের ছাত্র, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও আইনজ্ঞ, তাই জমিদারি দেখাশুনার ভার দিয়ে মথুরকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় রানীর তৃতীয়া কন্যার অকাল মৃত্যু ঘটল। তবু মথুরকে তিনি অন্যত্র যেতে দিলেন না, চতুর্থ কন্যাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে নিজের কাছে তাঁকে ধরে রাখলেন। মন্দির নির্মাণের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা অবধি বিষয়চিন্তা ছেড়ে দিয়ে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেছেন। গ্রহণ করেছেন স্বপাকে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন, শয়ন করেছেন তৃণশয্যায়। কালী নাম বার বার মুখে উচ্চারণ করে কামনা করেছেন মৃত্যুর পরে দেবীর পদাশ্রয়। জমিদারি শীলমোহরে এইভাবে অঙ্কিত করেছিলেন নিজের নাম—'কালীপদ অভিলাষিণী রাসমণি দাসী।'

রামকুমারের পৌরোহিত্যে ১২৬২ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিন (৩১ মে) মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হল। অতি প্রত্যুষে গদাধরও এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার মহোৎসব দেখতে অতি আগ্রহে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ভাব ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ তাঁর মন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিকাশে অপূর্ব রম্য পরিবেশে ঘুরে ঘুরে

সব কিছু দেখে চোখ দুটি তাঁর জুড়িয়ে গেল—দেখলেন গঙ্গাতীর সংলগ্ন কালীমন্দির, দ্বাদশ শিব ও রাধাকান্তজীর মন্দির, নাটমন্দির, চাঁদনী, বাঁধাঘাট, ভোগের ঘর, অতিথিশালা, নহবত ও বিস্তীর্ণ উদ্যান। এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে একের পর এক পরপারের উন্মুক্ত সুদূর অঞ্চল থেকে মনে হয় যেন নিপুণ এক শিল্পীর আঁকা অতি মনোরম বিরাট একখানি ছবি।

বিধিমত অভিষেক ও পূজা-অর্চনার পর দেবীবিগ্রহ ভবতারিণী, দ্বাদশ শিব ও রাধাকান্তজীর বিগ্রহ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত হল। গদাধর দিনভর ঢাকঢোলের বাজনা, পূজা-অর্চনা, প্রসাদ বিতরণ, অতিথিসেবা, অন্ধ-আতুর ও কাঙাল ভোজন দেখে সন্ধ্যাবেলায় মাত্র এক পয়সার মুড়িমুড়কি খেয়ে হৃষ্টচিত্তে ঝামাপুকুরে ফিরে এলেন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে আবার দক্ষিণেশ্বর যাত্রা। ক্রমাগত সাতদিন ধরে চলেছে মহোৎসব। দিনে পূজা-পার্বণ, প্রসাদ-অন্ন বিতরণ; ভোজনান্তে রানীর জয়গানে গঙ্গাতীর হয়ে ওঠে মুখরিত; আর রাত্রে যাত্রা, কথকতা ও কীর্তন। গদাধর একসময় দু'টি রেঁধে খেয়ে প্রত্যহ এই মহোৎসবে মেতে উঠতেন। উৎসবের ক'টা দিন দক্ষিণেশ্বরে এইভাবে কাটিয়ে দিয়ে ঝামাপুকুরে ফিরে গেলেন। কিন্তু সম্ভব হল না আর মন্দির ছেড়ে রামকুমারের ফিরে যাওয়া। রানীর একান্ত অনুরোধে স্থায়িভাবেই শেষে দেবীর নিত্যপূজার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হল। দক্ষিণেশ্বরে পূজা করে ঝামাপুকুরে টোল রাখা অসম্ভব। তাই পরে একদিন সময় করে গিয়ে টোল তুলে দিয়ে এলেন। গদাধর তখন দাদার সঙ্গে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

এর কিছুদিন পরে রামকুমারের এক ভাগ্নে—খুড়তুত বোন হেমাঙ্গিনী দেবীর ছেলে—নাম হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়, চাকরির জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। কামারপুকুর গ্রামের অতি নিকটেই শিহর নামে একটি গ্রামে হৃদয়রামের বাড়ী। হৃদয়রামের বয়স তখন মাত্র ষোল আর গদাধরের কুড়ি। আশৈশব তবু তাঁদের অপূর্ব প্রীতির

বন্ধন। পূর্বের সেই বালককালের মত এখানেও একজন অপরজনকে পেয়ে মহা খুশি। কত হাসি-গল্প, কত কথা, কিন্তু চাকরির কথা হলেই গদাধর চুপ করে থাকেন। গদাধর উদ্যানে বসে রান্না করে খান, হৃদয় তাঁকে সে কাজে সাহায্য করেন। হৃদয়ের খাওয়ার ব্যবস্থা বিগ্রহের প্রসাদ-অন্নে ও মন্দিরের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে। অতি আগ্রহে দু'জনই প্রয়োজনমত রামকুমারকে সাহায্য করেন। দীর্ঘ অবসর সময়ে হৃদয়ের কাটে চাকরির ভাবনায় আর গদাধরের কাটে গঙ্গার ঘাটে বসে, নয়ত পঞ্চবটীর উদ্যানে। উদ্যানে বসেই গদাধর একদিন গঙ্গামাটি দিয়ে শিবের অতি সুন্দর একটি মূর্তি গড়ে, অতি ভক্তিভরে পূজা করে একমনে যখন ধ্যানে রত তখন চলার পথে বটের ছায়াতলে মথুরবাবুর সহসা সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। পূজারী ধ্যানে তন্ময়, মূর্তিটি কাঁচামাটির, তবুও তাঁর মনে হল এই মূর্তি আর এই ধ্যানরত পূজারী যেন ত্যাগবৈরাগ্যের জীবন্ত প্রতীক। খবর নিয়ে জানলেন পূজারী রামকুমারের ছোটভাই, নাম গদাধর। তখন রামকুমারকে দিয়ে গদাধরকে ডাকিয়ে মূর্তিটি চেয়ে নিয়ে রানীকে দেখালেন ও রানীর সঙ্গে গদাধরের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এর কয়েকদিন পূর্বে রামকুমার হৃদয়কে ডেকে মথুরবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মন্দিরে হৃদয়ের চাকরির জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

স্নানযাত্রার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বছর না ঘুরতে ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর পর দিবস নন্দোৎসবের ভোগশেষে বিগ্রহকে কক্ষান্তরে নিয়ে যেতে পূজারী ক্ষেত্রনাথ পা পিছলে পড়ে গেলেন। তাতে বিগ্রহের পা ভেঙ্গে গেল। প্রত্যেকের মনেই এতে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা। পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন ভাঙা ঠাকুর গঙ্গায় বিসর্জন দিতে। গদাধর শুনে মথুরবাবুকে বললেন, 'কেন? রানীর জামাইদের কারও পা ভাঙলে রানী কি সে জামাইকে ত্যাগ করেন, না ডাক্তার ডেকে পা ভাল করেন? কই কোথায় ঠাকুর, দেখি কি হয়েছে?' তারপর ভাল করে দেখে নিপুণ হাতে পাখানি এমন করে জুড়ে দিলেন যে

বিসর্জনের আর কোন প্রশ্নই উঠল না। নূতন মূর্তি আনা হয়েছিল; বাক্সে সে মূর্তি বন্দী হয়ে পড়ে রইল, শুনেছি আজও আছে। এ ঘটনার পর গদাধরকে মন্দিরের পূজার কাজে নিযুক্ত করতে মথুরবাবু বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তিনি হৃদয়কেও বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করে দেখে এসেছেন—বেশ ছেলেটি; তাহলে মামা ভাগ্নে দু'জনেই মন্দিরের পূজার কাজে লেগে যাক। এরপর একদিন গদাধর ও হৃদয় একত্রে উদ্যানে যখন ভ্রমণরত তখন মথুরবাবু সহসা এগিয়ে এসে দু'জনকেই চাকরির কথা বললেন। শুনে আনন্দে অধীর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় সম্মতি দিলেন। কিন্তু গদাধর রইলেন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে। 'বেশ, চিন্তা করে পরে জানাবেন', এই কথা বলে মথুরবাবু অন্যত্র চলে গেলেন। হৃদয় গদাধরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ তো ভাল চাকরি, তোমার আপত্তি কেন?'

'তুই জানিস না, চাকরি নিলে মন্দিরের এত সোনাদানা ও সম্পত্তির দায়দায়িত্ব ভূতের মত আমার ঘাড় চেপে ধরবে, ও আমি পারব না।'

'আর সে ভার যদি আমি নেই?'

'তাহলে আপত্তি নেই—মথুরবাবুকে বল গে যা।'

হৃদয় ছুটে গিয়ে মথুরবাবুকে বলামাত্র চাকরি পাকা হয়ে গেল। গদাধর নিলেন প্রত্যহ বিগ্রহের বেশ পরিবর্তন করে সাজাবার ভার, আর হৃদয় হলেন রাধাকান্তজী মন্দিরের পূজারী। কিছুদিন পরে গদাধর বৈঠকখানার কেনারাম ভট্টাচার্য নামে তান্ত্রিক এক ব্রাহ্মণের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভাল করে শিখে নিলেন কালীপূজার মন্ত্র ও পদ্ধতি। অন্যান্য দেবদেবীর পূজাপদ্ধতিও অতি আগ্রহে শেষে শিখে নিলেন দাদা রামকুমারের কাছে। ভবতারিণীর বেশকারী হয়ে সর্বদা কাছে থেকে ভাবে ও ভক্তিতে অষ্টপ্রহর গদাধরের মুখে মা মা বুলি, অথবা রামপ্রসাদের গান। সন্ধ্যা হলে চুপচাপ বসে থাকেন —হয় গঙ্গার ঘাটে, নয়ত পঞ্চবটীর জঙ্গলে। গদাধরের এ ভাব লক্ষ্য

করে রামকুমার অত্যন্ত বিষণ্ণ ও চিন্তিত। শেষে মথুরবাবুকে একদিন অনুরোধ করলেন ভবতারিণীর পূজার সব দায়িত্ব গদাধরের হাতে ছেড়ে দিতে, কারণ মনটা মন্দিরের কাজেই নিবদ্ধ থাকলে অন্য ভাবনা মনে আর আসবে না। তিনি নিজে নেবেন রাধাকান্তজীর পূজার ভার, আর হৃদয় সব কাজেই তাঁদের সাহায্য করবেন। গদাধরের পূজা, ভাব ও ভক্তি দেখে এই ইচ্ছা মথুরবাবুর মনে বহুদিন থেকেই দানা বেঁধে উঠেছিল। শোনামাত্র তাই আনন্দে তিনি সম্মতি দিলেন। আর তখন থেকে দু' ভাইয়ের নাম রাখলেন বড় ভট্চাজ ও ছোট ভট্চাজ।

ভবতারিণীর প্রাত্যহিক পূজায় গদাধরকে নিযুক্ত করার পরেই যেন ফুরিয়ে এল রামকুমারের জীবনের সব দায়দায়িত্ব। ভাবলেন, ভালই হল—নিশ্চিন্ত মনে ছুটি নিয়ে এখন বাড়ী গিয়ে থাকা চলবে। ছুটি নিয়ে বাড়ী একবাব যাবেন ঠিক করে বিশেষ কার্য উপলক্ষে শেষে যেতে হল তাঁকে শ্যামনগর মূলাজোড়ে। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে সেখানেই অতি অকালে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। তিরোধানের ঠিক একবছর আগে তাঁর পৌরোহিত্যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থের প্রতিষ্ঠাযজ্ঞের পুরোহিত ও মন্দিরের সর্বপ্রথম পূজারী রামকুমারের নাম যুগ যুগ ধরে এই তীর্থের আদি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তুমি সগুণ ভুবন সৃজনকারণ
প্রলয় প্লাবন ধ্বংস,
করি এ কী খেলা কাটে সারা বেলা
এ কী খেলা হে নৃশংস!
রাখ ললাটে রুদ্র ভাস্কর তেজ
বহ্নি নয়ন জ্বালায়ে।
দিন গেলে শেষে সন্ধ্যা আকাশে
শিখা দাও তার নিবায়ে।

হেসে উঠি ফুল শেষে ঝরে যায়,
ঢেউ তুলে নদী সাগরে মিলায়,
তোমাতে প্রকাশ পুরুষ ও প্রকৃতি
যুগে যুগে অবতংস।
তুমি কূল হতে তরী অকূলে ভিড়াও,
যারে বয়ে আন তারে তুলে লও,
একলা খেলিছ, একলা চলিছ
নাই কারও কোন অংশ।
কিছুই বুঝি না কেন যে খেলাও ?
এ কী খেলা, হে নৃশংস !

অনিত্য সংসার। নিয়তির বিধানে দাদা রামকুমারের এভাবে অকাল তিরোধান গদাধরের শোকাভিভূত ভাবুক মনকে মহাভাবের পথে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেল। সংসারের অনিত্যতায় মৃন্ময়ী কালীকে তখন চিন্ময়ী রূপে প্রত্যক্ষ করতে চেয়ে চিন্তায়, গানে, ধ্যানে তাঁর অন্তর হয়ে উঠল প্রতিনিয়ত অসম্ভব ভাবাবেগে উদ্বেলিত। মন্দিরে বসে দুঃখী ছেলের মত ছল ছল চোখে তাকিয়ে থাকেন ভবতারিণীর মুখের দিকে। কখনও বা মা মা বলে বিরামহীন আর্তনাদে অবসাদ আসায় দেহ নিজের অগোচরেই মন্দিরে লুটিয়ে পড়ে থাকে।

'ঘরে এসে শোবে চল', হৃদয়ের ডাকে তন্দ্রা টুটে যায়, চোখের জলের বন্যায় ভেসে মা মা বলে আবার বুকফাটা আর্তনাদ করেন। 'দেখা তো দিলি না মা—জীবনের যে আমার আরও একটা দিন বিফলে চলে গেল।' হৃদয় নানা কথায় বুঝিয়ে জোর করে টেনে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতেন। ঠিক সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের পাখীদের ঐকতান ঠাকুরের ঘুম ভাঙিয়ে দিত। বাইরের বাগানে এসে চেয়ে দেখতেন গতকালের সন্ধ্যার অসংখ্য কলি সকালে ফুল হয়ে চোখ মেলে শাখায় শাখায় আনন্দে হেসে উঠেছে। পূজার জন্য ঐ ফুলগুলি তুলতে গিয়ে

আবার তন্ময় হয়ে যেতেন রামপ্রসাদের প্রাণমাতান গানে। ভক্তির অফুরন্ত আবেগে শেষে শুরু হত আর্তনাদ,—'পাষাণী রামপ্রসাদকে তুই দেখা দিয়েছিলি, আমাকে তবে দিবি না কেন?' অন্তর সমুদ্রের অথৈ অতলে তলিয়ে যেত তখন ফুল তোলা ও মালা গাঁথার কথা।

তোরে যায় না ধরা কোন মতে,
তুই তো মুক্তকারা বাঁধনহারা
ঝরণাধারা প্রেমের পথে।
কাননে দাঁড়াই এসে
ফুলের পাশে তোরই আশে
সে কি নয় মা তোর হাসি
ফুলে মিশি বেড়ায় ভেসে।
তুই তো কস্‌নে কথা,
তবু তোর পাই বারতা,
ছোটে মোর মন-ভ্রমরা
পাগল হয়ে সাথে সাথে।
যে কথা কও গো বসি
ছড়িয়ে হাসি ফুলের প্রাণে—
সে কথা বাতাস বয়ে
যায় গো লয়ে গানে গানে।
তবু তুই দিস না ধরা
ডাকিলে পাই না সাড়া
হলে মা মা বলে কেঁদে সারা
লুকিয়ে দেখিস আড়াল হতে।

একটু পরে মন্দির-সংলগ্ন পথঘাট যখন জনসমাগমে কর্মমুখর তখন আকাশের পানে তাকিয়ে দেখে ভাব-সম্বরণ করে শৌচ ও স্নান সেরে

মন্দিরে প্রবেশ করতেন। পূজারম্ভের সব রকম উপকরণ অতি যত্নে হাতের কাছে গুছিয়ে নিয়ে শুরু হত প্রতিমার বেশ পরিবর্তন ও সাজের কাজ। বার বার চেয়ে দেখে সে সাজ মনের মত হলে মা মা বলে তারপর গ্রহণ করতেন পূজার আসন। করন্যাস, অঙ্গন্যাস প্রভৃতির পর অনুভব করতেন দেবী যেন কল্যাণ হস্ত প্রসারিত করে সম্মুখে আবির্ভূতা! বিধিমত শুরু হত মন্ত্রপাঠ। দেবীর করুণা-আশীষ যেন শতধারায় বর্ষিত হত তখন আসনের চতুষ্পার্শ্বে ও মস্তকে। পূজার প্রতিটি ফুল, প্রতিটি বিল্বপত্র সতত অন্তরনিঃসৃত ভক্তিধারায় সিক্ত করে সমর্পণ করতেন তিনি দেবীর শ্রীচরণে। তাঁর এই ভক্তির পূজা দেখতে মন্দিরের সামনে প্রত্যহ জমে উঠত দর্শকের ভিড়। পূজাশেষে অবিশ্রান্ত আর্তকণ্ঠের মা মা ডাকে করুণ বাৎসল্য ভাব ফুটে উঠত তখন ঐ পাষাণ প্রতিমার চোখেমুখে। তবু সে মুখ বোবা, বুক স্পন্দনহীন নীরব। কিন্তু পূজারীর অন্তর চায় ঐ পাষাণময়ীকে কোমল সহাস্য বদনে চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করতে; চায়, মা যেন তাকে শিশুর মত কোলের কাছে আঁকড়ে রেখে, দিনরাত তাঁর সঙ্গে খেলা করেন। এই মহাপূজারীর পূজার সব কাজ যখন সাঙ্গ হত পূর্বের সূর্য পশ্চিমে তখন প্রায়ই হত অস্তমিত। ঠাকুর স্বপাকে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও খাওয়ার একটু পরেই সন্ধ্যারতির সময় হওয়ায় নহবতখানায় বেজে ওঠে ঢাক-ঢোল-কাঁসর। বৈকালিক সব কাজ সাঙ্গ হলে মাকে প্রণাম করে আবার যখন বাইরে আসেন রাত্রি প্রথম প্রহর তখন প্রায় অতীত হয়ে যায়। সে রাত্রির রূপ কখনও বা সুধাক্ষরা চাঁদের হাসিতে গাঢ় শ্যামলিমায় উজ্জ্বল আবার কখনও বা অসংখ্য নক্ষত্রখচিত নিবিড় কালিমাময়। নিম্নে গঙ্গা—হয় তার বুকে বানের উত্তাল প্রলয় তাণ্ডব, নয়ত ভাটার টানে চলচঞ্চল নূপুরের নৃত্যচপল গতিছন্দ। ঐ পাগলের বুকও তখন ভাবে তোলপাড় করে, মুখে শুরু হয় মা মা বলে হৃদয়বিদারী আত্মঘাতী আর্তনাদ। তাঁর ভাবের চোখে গঙ্গাতীর তখন এক ভুবনমোহিনী মূর্তি ধারণ করে।

কি বাঁশি বাজালে সুরধুনী কূলে
কোথায় চলেছি ভাসিয়া।
হে চিরমধুর নিলাজ নিঠুর
তোমারেই ভালবাসিয়া।
জ্যোৎস্না আকাশে কুসুম সুবাসে,
কূলে কূলে বাঁশিসুর ভেসে আসে।
কুলু কুলু ভাষে বুঝায়ে আভাসে
লুকোচুরি খেল হাসিয়া।
আঁধার আকাশে হেরি যবে তারা—
তারা নাম স্মরি কেন বহে ধারা?
ডাকি তারা তারা, পাই নাকো সাড়া
দেখা দাও কাছে আসিয়া।

'আরে ও পাষাণী, দিনরাত ধুলো কাদায় পড়ে থেকে, চিৎকার করে ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে আর তোকে না পেয়ে যদি আমি মরে যাই তবে তোর লাভটা কি হবে? আমি জানি আমার প্রাণের অহোরাত্রি জ্বলন্ত প্রদাহ আড়ালে লুকিয়ে থেকে তুই সব দেখিস! মা হয়ে কেমন করে ভবে থাকিস?'

এই প্রকার দিনের পর দিন একটি একটি করে যতই চলে যেতে লাগল ততই শেষে সব কিছু ভুলে আর্ত চিৎকারে কেবল মা মা বলে গঙ্গার ঘাটের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতেন। বদ্ধ উন্মাদ—মাটি-মাখা বস্ত্র কখনও পরিধানে একখানা থাকত, কখনও একেবারে উলঙ্গ। এইরূপ করুণ অবস্থায় ভাগ্নে হৃদয় কাদামাখা আর কঙ্কালসার শীর্ণ দেহ ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে গিয়ে অসহ্য ব্যথায় কতদিন কেঁদে ফেলেছেন; একদিন বললেন, 'এমনি দিনরাত মা মা বলে চিৎকার করে কাদায় কেবল আছাড় খেয়ে তুমি যে মরে যাবে মামা!'

'যাই যাব—তাতে তোর কি শালা?' শুনে হৃদয়ের চোখ আবার

জলে ভরে গেল। তাকিয়ে দেখে ঠাকুর বললেন, 'ও কি তোর চোখে জল, তুই কাঁদছিস? আমার কথায় বড় আঘাত লেগেছে, না? না না, কি যে কারে বলি, মাথার আমার কিচ্ছু ঠিক নেই। তোকে আমি বড় দুঃখ দিয়েছি; না না, তুই কাঁদিস নে।—ঐ পাষাণী কাছে থেকেও চোখ বুজে থাকে আর তুই দিনরাত প্রাণ দিয়ে আমার সেবা করিস।'

সত্যিই দরদী মন নিয়ে মায়ের মত সর্বদা জাগ্রত দৃষ্টি রেখে একটানা তিরিশ বছর ধরে হৃদয় মুখুজ্জে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেছেন। প্রায় প্রতিদিন মামাকে ধুইয়ে মুছে পরিষ্কার বিছানায় এনে শুইয়ে দিয়েছেন। একটু পরে ঘুম থেকে চমকে উঠে চেয়ে দেখতেন, মামা উধাও। মামা বিছানায় আর শুয়ে নেই।

'মামা, ও মামা', কোথায় মামা! গিয়ে দেখতেন, উলঙ্গ হয়ে দূর জঙ্গলে, নয়ত আমলকী গাছের তলায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। ঢিল ছুড়ে ছুড়ে মামাকে ভয় দেখাতেন, কিন্তু মামা নির্বিকার। শেষে অবশ্য বুঝেছিলেন—'মামা যে আমার ভয়কে ভয় পাওয়ানো মামা'। পঞ্চবটীর মূলে আট বছর ধরে কঠোর তপস্যায় রত মামার মাথার চুলে গায়ে পাখীদের নিক্ষিপ্ত মলমূত্র সাফাই করে মুখে গুঁজে দিয়েছেন অন্নজল। পরবর্তী কালে সর্বত্র সর্বদা ছায়ার মত হতেন মামার অনুগামী।

খুলে দে মা চোখের তারা
দেখি তারা কেমন ধারা।
আর কতকাল মা মা বলে
কাঁদব বসে বল মা তারা।
যদি ছেলে ভুলে দূরে রলি,
কেন ছেলের মন ভুলালি?
রব বন্ধঘরের অন্ধকারে
আর কতকাল মাকে ছাড়া।

আজ এ বুকের পাঁজর খুলি,
হৃদিপদ্ম লয়ে তুলি,
দিয়ে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি
শেষের পূজা করব সারা।

কখনও ভাববিগলিত করুণ সুর। আবার পরক্ষণেই ধূলিধূসরিত দেহে আছাড় খেয়ে খেয়ে বুকফাটা আর্তনাদ। এ দৃশ্য দেখে কতদিন কত পাষাণ হৃদয়ও গলে যেত আর অশ্রু প্রবল ধারায় ঝরে পড়ত। 'ওরে ও পাষাণী, অন্ধ চোখ দুটি আমার খুলে দে—দেখতে তুই কেমন একবার চেয়ে দেখি। অসহ্য এ জ্বালা আমার জুড়িয়ে যাক। আর তা না হলে —এইবার, এইবার তা হলে চেয়ে দেখ!' এই বলে মন্দিরের বলির খড়্গ বের করে নিয়ে আত্মবলিতে যখন কৃতসংকল্প সহসা তখন যেন ঝড়ের প্রবল ফুৎকারে নিবে গেল চোখের সম্মুখে দিবালোক।

জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলে ওষ্ঠদ্বয় হল স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকলির ন্যায় ঈষদুন্মুক্ত হর্ষোজ্জ্বল। অর্ধনিমীলিত চক্ষুদ্বয় স্থির অচঞ্চল; চিত্তলোকে ফুটে উঠল চিন্ময়ী মাতৃমূর্তি। আর তা প্রতিবিম্বিত হল মন্দিরের অন্ধকারের পটভূমিকায় অর্ধনিমীলিত চোখের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে।

তাঁর ধ্যানের কালিকা চিন্ময়ী হয়ে সহাস্য বদনে মঙ্গল হস্ত প্রসারিত করে সম্মুখে এবার দণ্ডায়মান। ব্রহ্মাণ্ডের যত রূপ, যত রঙ, জ্যোতির্ময় তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে সে দেহের প্রতি অঙ্গে হাসছে। আর মুহূর্তে মুহূর্তে সে রূপের পট পরিবর্তন। একবার শান্ত শ্যামশ্রী, আবার প্রলয়ঙ্করী মহাভয়ঙ্করী।

কৃষ্ণা, শ্যামা, নীলাম্বরবসনা,
নক্ষত্র রত্নালঙ্কারভূষণা, মেঘকুন্তলা,
কটিদেশে সপ্তসিন্ধু মেখলা,
বক্ষে প্রেম পীযূষধারা

কুলু কুলু গঙ্গা ও যমুনা।
কালের বক্ষে কাল ভয়হারিণী,
ভক্তের হৃদয় পদ্মবাসিনী।

'তুই কি আমার সেই—এ দেহ যুগ যুগ জন্ম জন্ম সাধনায় পাত করে, চির-আকাঙ্ক্ষিত ধন দুর্গা ও কালী? কিন্তু চোখের কয়েকটি মাত্র পলক না যেতে, আবার তুই এ কী নির্মম প্রলয়ঙ্করী ভয়ঙ্করী—ভ্রূকুটি কুটিল নয়না, করালবদনা, বিবসনা, প্রকটিত বিকট দশনা, রুধির-সিক্ত করাল লোলরসনা, মুণ্ডমালা বিভূষণা—খরকরবালে তাথৈ তাণ্ডবে এ কী রক্তক্ষয়ী মহাপ্রলয়! মা তোর রূপের অন্ধকারে সব যে শেষে লয় হয়ে গেল? না না, মা না! তোর এই রূপ সম্বরণ কর।—আমি যে আর দেখতে পারি না মা।'

কালী ভয়ঙ্করীর রূপ ধরে আর
দাঁড়াসনে মা হে শঙ্করী!
যদি মা হয়ে তুই ভয় দেখাবি,
ভয় পেয়ে বল কারে স্মরি।
তোর বাম করে খর প্রলয় অসি,
করালিনী এলোকেশী!
রুধিরে দেশ যায় যে ভাসি
রূপ দেখে তাই ভয়ে মরি।
গলায় দোলে মুণ্ডমালা
দেখাসনে আর নিঠুর খেলা।
ফিরে দেখ চেয়ে তোর পায়ের তলায়
শিব যেতেছে গড়াগড়ি।

ভক্তের আকুলতায় চোখের নিমেষে মা আবার শান্তশ্রী শ্যামলা,

মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধ অরুণোদয়ের লাবণ্য বিকাশে—রামপ্রসাদের পরমারাধ্যা বঙ্গজননী বঙ্গদুহিতা শ্যামা মাতৃমূর্তি।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

এ কী মা, আমি যে তোর কালরূপের ভিতরেই দেখতে পাচ্ছি বিশ্বময় জড়জগতের প্রতিটি অণু ও পরমাণু। আর এই মহাসত্যকেই কেন্দ্র করে নিরন্তর প্রবল গতিতে ছুটে চলেছে জীব-জগতের রহস্যাবৃত চিরন্তন ধারা। তাহলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যে ধারণ করে আছে, সে কি মা তোর ঐ কালরূপেরই ঘুটঘুটে অন্ধকার। কালরূপে মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে তাবায় তারায় সেজে তুই কি মা শুধু এক—তোতেই কি শেষে শত সহস্র কোটি অসংখ্য রূপের ক্রমবিকাশ ও মহিমার প্রকাশ!

নমি চির অন্তরযামী
তুমি যে ছবি এঁকেছ অনন্ত ভবি
তারি মাঝে হেরি তুমি।
আমি শুনেছি তোমার গান,
'পুষ্পের সনে কাননে কাননে
বাতাসে পাতিয়া কান।'
আমি দেখেছি তোমার হাসি
যবে গগনে উদয় শশী
আমি শুনেছি তোমার বাঁশি
যেথা তুলি কলতান তটিনী উজানে
কূলে কূলে গেছে ভাসি।
বেজেছে করাল প্রলয় বিষাণ
কতকাল কতদেশে।
কত লোকালয় সেজেছে শ্মশান

জ্বলে পুড়ে নিঃশেষে।
মোর চির অন্তরযামী
আমি যেরূপ হেরিনু হৃদয়ে বাহিরে
হে বিরাট সে যে তুমি!

২

তিন দিন তিন রাত কেটে যাওয়ার পর সমাধিভঙ্গ হওয়ায় ঠাকুর আবার বাহ্য চেতনায় ফিরে এলেন। কালীর নামে গানে কখনও তন্ময় বিভোর, কখনও বা ভাবোন্মাদ ঠাকুরের সমাধির কথা কানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে রাসমণি ও মথুরবাবু। স্বচক্ষে এ অবস্থা দেখে তাঁদের ভক্তি ঠাকুরের প্রতি আরও অধিক বেড়ে গেল। এরপর ঠাকুরের সাধনায় কোনও বিঘ্ন উপস্থিত যাতে না হয় তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থায় রানী নিজেই স্বয়ং তৎপর হয়ে উঠলেন।

চোখের সম্মুখে মাতৃরূপে অরূপের রূপ প্রত্যক্ষ করে, চোখের আড়াল সে যেন আর তাঁকে কিছুতেই করতে চায় না। অথচ একবার মাত্র দেখা দিয়ে আড়ালে অগোচরে মা সর্বদা আপনাকে লুকিয়ে রাখেন, ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে। তখন নিজেকে কাল বিড়ালের ছোট একটি ছানা মনে করে, প্রথম শুরু করত মিউ মিউ কান্না। দেহকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আছাড় খেয়ে খেয়ে রাতদিন কেঁদে, পরমবস্তুকে লাভ করে তাকে হারানোর অপরাধে নিজের উপর আসে ধিক্কার। শেষে মা মা বলে বুকফাটা চিৎকারে হাঁপিয়ে উঠায় প্রাণ যখন প্রায় বেরিয়ে যায় আবার ঠিক তখন দিব্যচোখের সম্মুখে ফুটে ওঠে মাতৃমূর্তি। দিব্যচাখে কেবলমাত্র তিনিই সে রূপ প্রত্যক্ষ করতেন।

ওমা খেলিসনে আর লুকোচুরি
চোখ ধাঁধিয়ে বারে বারে।
তোরে ধরতে গিয়ে পথ হারিয়ে
হাতড়ে মরি অন্ধকারে।
প্রাতে কতই রঙে হাসিস বসে,
কাননভরা ফুলে ফুলে।
দেখে ভরা গঙ্গা প্রেম তরঙ্গে
নাচে খেলে লহর তুলে।
সাঁঝের বেলা আকাশভরা
হেসে ওঠে চন্দ্র তাবা,
তাব মাঝে তুই তন্দ্রাহারা
জাগিয়ে রাখিস আপনারে।
শিশু কাছে মাকে পেলে
কোলে ওঠে খেলনা ফেলে,
আর ছাড়ব না কোল, যাবি না বল
ভুলিয়ে রেখে চুপিসারে।

চোখে দেখতে পেয়েই শিশুর মত একেবারে চুপ। আবার অদৃশ্য হলে ভেঙে পড়েন। কারণ একটা অনুসন্ধান করে আপনিই শেষে খুঁজে বের করলেন, 'মা আর আমি এই দু'য়ের মাঝখানে দুরতিক্রম্য বাধার প্রাচীর এখনও সম্পূর্ণ অপসারিত হয়নি—তাই ইচ্ছা হলেই মাকে দেখা যায় না। হয়ত এখনও আমি আমার অহৈতুক অহংকারকে বিসর্জন দিতে পারি নি। মনের কোণে অগোচরে হয়ত লুকিয়ে আছে কাম, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলি—সুযোগ বুঝে তারা আত্মপ্রকাশ করবে। এখন এদের একেবারে নির্মূল করতে হবে। ছোট বিড়াল ছানাকে মুখে করে তার মা যেমন এঘরে ওঘরে ঘুরে বেড়ায় আমিও ঠিক তেমনি মায়েরই সাহায্যে মায়ের ইচ্ছামত

বিচরণ করব। মায়ের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—আমার স্বীয় ইচ্ছার কোন অস্তিত্বই থাকবে না।' সর্বদা মায়ের কাছে থাকবেন এরূপ ভাবার সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল বিড়াল ছানার মত মিউ মিউ করে মাঝে মাঝে চিৎকার। 'আর পাপরিপু ও অহঙ্কারকে একেবারে নির্মূল করতে হলে ঐ যে মন্দিরের প্রবেশপথের দু'দিকে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ক্ষীণকায় কঙ্কালসার জনতা—সাধ্যমত নিজ হাতে এদের সকলের সেবা আমাকে করতে হবে। তা ছাড়া জগতের সকল নারীকে মনে করতে হবে এরা সবাই আমার করুণাময়ী মা। আর টাকা—যার প্রবল আকর্ষণ ঘুড়ির স্থতোর মত, টানে টানে উচ্চমার্গ হতে নিম্নে টেনে ফেলে দিয়ে ভগবানকে পাওয়ার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করে—অতি সাবধানে তা থেকে দূরে থাকতে হবে।'.

টাকাকে তখন মাটির ঢেলা মনে করে গঙ্গায় 'দূর যা' বলে ছুড়ে ফেলে দিতেন। ভোজনের পর কাঙালীদের এঁটোপাত বয়ে দূরের আবর্জনায় ফেলে আসতেন। অপবিত্র মলমূত্র কোথাও পড়ে থাকলে নিজেই তা সাফ করে ফেলেছেন। এ সব দেখে দেখে আমলাদের একদল ক্ষেপে উঠে প্রবল উত্তেজনায় রানীর সদর দপ্তরে প্রতিকার চেয়ে আরজি পেশ করলেন। তার ফলে দেবীপূজার ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে মথুরবাবু এসে একদিন মন্দিরের দরজায় উপস্থিত। দেখলেন বিধিমত পূজা সাঙ্গ করে পরে মা-মা বলে কেঁদে ঠাকুর আকুল। শিশুর মত একটু পরে কি দেখার পর সে কান্না আপনি থেমে গেল—শেষে মা-মা বলে আনন্দে নেচে আত্মহারা—অনর্গল কথা বলে চলেছেন। মন্দিরের অভ্যন্তর মনে হল কার পদভরে যেন মহাভারাক্রান্ত, থমথমে কেমন একটা ভাব! জড় পাষাণ প্রতিমার মূর্তি সহসা যেন তখন করুণাঘন, বাৎসল্যভাবে পরম পরিতৃপ্ত। আনন্দে ভক্তিতে আবেগে মথুরবাবুর সর্বশরীর হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত। মহাভাবে তন্ময় আত্মভোলা ঠাকুর মথুরবাবুর এভাবে আসাযাওয়ার কথা কিছুমাত্র টের পেলেন না। যাওয়ার বেলায় এই বলে আমলাদের সাবধান

করে দিয়ে গেলেন, তারা যেন ছোট ভট্চাজের কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। কিন্তু এতে তাদের ক্রোধের উপশম হল না, মাত্রা আরও বেড়ে গেল, ছু'একজনের গলার চিৎকার অকথ্য গালাগালিতে সপ্তমে উঠল। পরদিন অতি প্রত্যুষে এক আমলার সঙ্গে দেখা হতেই সে মারমুখো হয়ে ঠাকুরকে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'কিরে বামনা, মন্দিরে বিড় বিড় করে কি মন্তরে মথুববাবুকে ঠাণ্ডা করলি। গরম হয়ে শেষে আমাদেব উপর ঝাল ঝেড়ে চলে গেলেন। কতরকম ভেলকিই জানিস।'

ঠাকুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'মথুরবাবু কখন এলেন আর কখনই বা গেলেন—আমি তো কিছুই জানি না!' আ হা হা ন্যাকা—ইনি তাঁকে দেখেন নি; কিছু জানেন না, ভিজে বেড়াল; ছুয়ারে ছুঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন—যাক এখন রানী একদিন স্বয়ং এলে হয়। তোর কুকর্মের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী এখানে আর ছু'একজন নয়, অসংখ্য। গলাধাক্কায় সেদিন যদি মন্দিরের বাব তোকে না কবি তো তবে বাপের বেটা আমি নই। ঠিক জেনে নে, এখানে থাকাব মেয়াদ তোর ফুরিয়ে এসেছে। আর মন্দিরে কাল তোর কাল আসবে।'

কালের ভয়ে আর কি ডরি।
কালের বুকে কালীর চরণ
দেখেছি ছু'নয়ন ভরি।
ওরে অহঙ্কারে মত্ত হলে
তার কি ভবে কালী মেলে?
ঐ এক মায়েরই সকল ছেলে
জাত কি যাবে ছোঁয়া খেলে!
ওদের এঁটো বয়ে মাথায় নিলে
অহঙ্কার তোর যাবে ছাড়ি।
সবারে তুই বাসরে ভাল,

রইবে না আর মনের কাল,
করে কাল রূপে ভুবন আলো
তোরে বাড়াবেন মা চরণতরী।
ও মন—কর তুই এমনি ধরন সাধন ভজন
ভবের তুফান দিতে পাড়ি।

স্বয়ং এসে মথুরবাবুর দেখে যাওয়ার পরও ঠাকুরের পাগলামির নিত্যনূতন গল্প গিয়ে উঠল রানীর কানে। তাই অতিষ্ঠ হয়ে তিনি ঠাকুরকে নিজের চোখে একদিন দেখতে এলেন। আমলাদের কেউ কেউ তখন রানীর কানে আরও অনেক কথা তুলে দিয়ে ঠাকুরকে ভয় দেখাল। ঠাকুর ভাবলেন, 'আমি মায়ের কোলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকব—দেখি কোন শালা আমার কি করে!—আর হোক না রানী! দেখব কি করে আমাকে মায়ের কোলের কাছ থেকে টেনে বের করে দেয়।' ভেবেই ঠাকুর তাঁর কাপড়গামছা নিয়ে ভবতারিণীর কোলের কাছে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলেন আর ওখান থেকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছেন রানীর গতিবিধি—শিশু যেমন মায়ের আঁচল ধরে ভয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করে ঠিক তেমনি। রানী ভবতারিণীকে প্রণাম করতে মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এসে হতবাক, 'এ কি দেখছি!'—ভাবলেন মূর্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে! 'এ মূর্তি যেন আর পাথরের নয়, এ যেন আঁচলধরা লীলাচঞ্চল শিশুকে বুকের কাছে নিয়ে করুণায় ঢল ঢল চিন্ময়ী মাতৃমূর্তি বাৎসল্যভাবের পরিপূর্ণ বিকাশে পরিতৃপ্ত;' ভাবে, ভক্তিতে দু'চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা। প্রণাম করে উঠে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আপন মনে বলে উঠলেন, 'সত্যই এ মহাতীর্থ। সত্যই সার্থক হয়েছে মা তোমার মন্দির গড়া'। ঠাকুরকে ভক্তিভরে গড় হয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুর মাথায় হাত দিয়ে রানীকে প্রাণ খুলে করলেন আশীর্বাদ। দু'জনেরই চোখে আনন্দাশ্রু। আমলারা কেউ কেউ নানা কথা

বলাবলি করে এ দৃশ্যটা তখন উপভোগ করেছিলেন একটুখানি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে।

এরপর ঠাকুর দিনরাত মায়ের কাছে আত্মশুদ্ধির প্রার্থনা জানাতেন। তার ফলে অন্তর পার্থিব কামনা বাসনা হতে চিরমুক্তি লাভ করে মেঘমুক্ত আকাশের মত হল স্বচ্ছ ও পবিত্র। সেই অন্তরে প্রতিবিম্বিত হল তখন রাত্রিদিন ব্রহ্মময়ী মায়ের অনন্ত বিশ্বরূপ।

শেষে অন্তরে ও অনন্ত বিশ্বে স্রষ্টাকে ইচ্ছামত দেখতে পেয়ে মন সম্পূর্ণ সুস্থ ও সতেজ হয়ে উঠল। পরবর্তীকালে ঠাকুর কতদিন কতখানে কত ভক্তকে ডেকে ডেকে বলেছেন, 'মা আমার জ্যোতির অনন্ত সমুদ্র, তার ঢেউ আনন্দে রাত্রিদিন আমার অন্তর স্পর্শ করে থাকে। নুনের পুতুল সমুদ্রের গভীরতাকে জানতে চেয়ে আপনাকে তার মাঝে সম্পূর্ণ হারিয়ে এখন বসে আছেন। নিজের কাছে নিজের অস্তিত্বের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। মা ও ছেলে আত্মা ও পরমাত্মা —তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারে এব অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অভিন্ন।'

পূজা করতে বসে পূজার ফুল তখন নিজের মাথায়ও তুলে দিতেন। নৈবেদ্য ভোগ কাক কুকুর কাছে থাকলে তাদেরকেও বিলিয়ে দিতেন। পূজাশেষে মায়ের শয্যায় শুয়ে পড়ে আবদারের সুরে মাকে বলতেন, 'দেখ মা, আজকাল অনেক নাম-করা পণ্ডিত প্রায় প্রত্যহ এখানে আসেন, কতরকম শাস্ত্রকথা বলেন. মন দিয়ে শুনি, কিন্তু সবকিছু তাব বুঝি না। আমি এখন জানি একমাত্র তোকে। আমাব অবসর সময়ে সব শাস্ত্রগুলি আমাকে তুই শিখিয়ে দে।' অন্তরে ভবতারিণীর উত্তর পেলেন, 'পুঁথি পড়লে পণ্ডিত হওয়া যায়; কিন্তু ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না। পক্ষীবিশেষের ন্যায় অতি ঊর্ধ্বে উড়ে গিয়েও মন পড়ে থাকে নিম্নের ভাগাড়ে। তুই বরং এক কাজ কর—যত রকম ধর্ম আছে তার প্রতিটির নির্দেশ ও অনুশাসন মেনে যোগবলে একেবারে শীর্ষে উঠে যা, তখন দেখবি।'

'কি দেখব মা?'

'দেখবি নির্দেশমত প্রদর্শিত পথে চলতে চলতে অতি উর্ধ্বে উঠে গিয়ে ওর সবগুলিই একটিমাত্র মহাসত্যে মিলিয়ে আছে। তখনই লাভ হবে তোর প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। সেই পরম জ্ঞান লাভ হলে ঐ পুঁথি-পড়া পণ্ডিতরা দেখবি তোর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নেবে। যোগীর সাধনালব্ধ জ্ঞানের লিপিবদ্ধ পুঁথি পড়েই তো সমাজে ওরা সব নাম-করা বড় বড় পণ্ডিত।' এরপরই শুরু হল নির্দেশিত মহাপথে চলার সবরকম প্রস্তুতি। অচিরেই অতি নিষ্ঠার সহিত ব্রতী হলেন তিনি গৃহদেবতা রঘুবীরের সাধনায়।

রামং লক্ষ্মণপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ধার্মিকম্॥
রাজেন্দ্রসত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিম্।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্॥

ভজ রাম রাম রাম রামনাম—
ভজ রামচন্দ্র গুণধাম।
দূর্বাদল সম শ্যামলবরণ,
নীলোৎপল জিনি বদন সুশোভন,
সত্যের পালক রঘুকুলতিলক
দণ্ডকবন-চারী রাজা রাম।
রাম রাম রাম রামনাম।

রাজবেশ পরিহারি, বল্কল জটাধারী
উদ্ধারিলে সীতা রাবণ সংহারি,
মর্তের মানব দেব লোকে দুরলভ
ভক্ত হৃদয় খুলি দেখাইল নাম।
রাম রাম রাম রামনাম।

হিংসা কলুষ পাপ লোভ পরিহারে,
রাম ভজন কর খলু সংসারে।
দাশরথি সীতাপতি রাম অগতির গতি,
দীন পতিত ডাকে হয়ো নাকো বাম।
ভজ রাম রাম রাম রামনাম।

পরম সত্য রূপে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রঘুবীর ধবাধামে অবতীর্ণ। জগতের এই পরমসত্য রঘুবীরের সাধনায় ব্রতী হয়ে আপনাকে সর্বদা মনে কবতেন তিনি পরমভক্ত পবননন্দন মহাবীর—ভক্তিবলে যে বীর আপনার বুক চিরে ফেলে সীতারামের যুগল মূর্তি সীতাকে প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। মহাবীরের ভাবে পরমসত্য রঘুবীরের সাধনা করে অচিরেই তিনি সিদ্ধি লাভ করলেন। রঘুবীরের সাধনায় ব্রতী হয়ে মহাবীর হনুমানের মত গাছে চড়ে বিকৃত মুখভঙ্গিতে দু'হাতে খোসাসুদ্ধ কদলী ভক্ষণের কাহিনী কামারপুকুরে চন্দ্রমণির কানে যখন গিয়ে পৌছল তখন গ্রামের কয়েকজন মহিলার কৌতূহলী হয়ে ঘরে দু'বেলা এসে প্রত্যহ এ তত্ত্বের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করা শুরু হয়ে গেল। দু'একজন যেচেই উপদেশ দিলেন, 'এবারে গদাইয়ের বিয়ে দাও, বয়স হয়েছে, কেউ বললেন, 'এ বয়সের ছেলেরা বিয়ে না করে কলকাতায় গেলে এক এক জন এক এক কায়দার হনুমান হয়ে যায়।' এ সব প্রত্যহ নানা মুখে দিনভর শুনে শুনে ভয়-ভাবনায় অসম্ভব বিচলিত হয়ে উঠল চন্দ্রমণিব মন। তিনি তাঁর নয়নমণি গদাধবকে একটিবার মাত্র চোখের দেখা দেখতে চেয়ে অবিলম্বে বাড়ী চলে আসতে চিঠি লিখলেন।

কিছুদিন আগে ঠাকুরের খুড়তুতো এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—রামতারক চট্টোপাধ্যায়, অপর নাম হলধারী, হৃদয়রামের তিনি সাক্ষাৎ মাতুল, কাজের সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। দেবীপূজার দায়িত্বভার তখন হৃদয় ও হলধারীকে বুঝিয়ে দিয়ে ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে মায়ের

ডাকে ছুটে গেলেন কামারপুকুরে। রামতারক ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। তাই কিছুদিন পরে কালীপূজার ভার হৃদয়কে দিয়ে রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার নিজে গ্রহণ করলেন।

ছেলেকে নিজের কাছে পেয়ে চন্দ্রমণির সকল দুর্ভাবনার অবসান ঘটল। আবার প্রায় প্রত্যহই তখন প্রসন্নময়ী, ধনী ও চন্দ্রমণিকে নিয়ে ঠাকুরের ভজন ও কীর্তনের আসর বসা শুরু হয়ে গেল। সবাই তখন ভাবতেন, 'এ ভাব তো আগেও ওর ছিল, এখনও তাই-ই আছে, তবে পরিবর্তনটা এমন আর কি হয়েছে?' কিন্তু ক'দিনের ভিতরই মহাপরিবর্তন উপস্থিত। শুরু হয়ে গেল ভাবাবেগে মা-মা বলে প্রতিনিয়ত পূর্বের মত আবার বুকফাটা আর্তনাদ। মা ভেবে অসম্ভব বিচলিত। দাদা রামেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বৈদ্য ও ওঝাদের ডেকে আনলেন। ঔষধ প্রয়োগ ও প্রক্রিয়ায় কিছুই ফল হল না। কান্নায় বিচলিত হয়ে চিন্ময়ী মা শেষে হৃদয়পদ্মে যখন অধিষ্ঠিতা হলেন তখন কান্না ও উন্মাদনা এক নিমেষে থেমে গেল। তারপর সম্পূর্ণ যখন সুস্থ তখন রামেশ্বরের অনুরোধে বৈদ্য আর একবার এসে ভাল করে দেখে বলে গেলেন, 'বিয়ে দিন, বিয়ে দিলে মনে হয় এ রোগ একেবারে সেরে যাবে'। এর পর থেকেই রামেশ্বর পাত্রীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মা একদিন ঠাকুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর বিয়ে দেব—করবি তো? না বেঁকে বসে পাগলামি করবি।' উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'তোমাদের যা ইচ্ছে কর'। সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেল। ৩০১ টাকা পাত্রীর পণ। পাত্রী জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছ'বছর বয়সের কন্যা—নাম সারদামণি। এ পাত্রীর সন্ধান ঠাকুর নিজেই দিয়েছিলেন। ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষে বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। ঠাকুর তখন ২৪ বছরের যুবক। বিবাহের পর দেখা গেল, সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হৃদয়ে যেন মহাশক্তির প্রভাব আরও প্রবল বেগে সঞ্চারিত হয়েছে। চাঞ্চল্য ও উন্মাদনা কমে যাওয়ায় দিনভর ভাবের ঘোরে তখন তন্ময়। আর রাত

হলে হয় ভূতির খালের পাশে, নয়ত বুধুই মোড়লের মহাশ্মশানের অভ্যন্তরে মহাকালীর ধ্যানে নিমগ্ন। সারদামণি তখন নিতান্ত বালিকা। তাই এসবের কিছুই বুঝে উঠতেন না। চন্দ্রমণি বিষণ্ণ হয়ে প্রতিদিন দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রায় কাল যাপন করতেন। প্রতিবেশীরা যার যা খুশি এসে বলে যায়, বৈরাগী দুয়ারে এসে গান ধরে।

দেখে এলাম শিবেরে তোর
শ্মশানভূমে আছে পড়ি।
ঘরণী যার মা ভবানী
সে কেন হয় শ্মশানচারী ?
সে কেন হয় এমন পাগল,
সুধার বদল পিয়ে গরল,
ভাবে ভোলা হরি বোলা,
ধূলাতে যায় গড়াগড়ি।
যখন বলে তারা তারা,
ত্রিনয়নে প্রেমের ধারা—
হৃদকমলে দেন মা সাড়া
আহা কী রূপ মরি মরি !

ভয়ে-ভাবনায় মায়ের হৃদয় অসম্ভব বিচলিত দেখে, ঠাকুর মায়ের কাছে বসে নানাভাবে তাঁর সেবা ও গল্প করে মায়ের অন্তরের ভয় ও গ্লানি দূর করে দিতেন। কামারপুকুরে আসার পর পুরো একটি বছর গত হয়েছে। সারদামণির বয়স এখন সাত বছর। সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী তাই ঠাকুর সারদাকে নিয়ে জয়রামবাটী একবার ঘুরে এলেন। তারপর বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মথুরবাবু, রানী রাসমণি ও দক্ষিণেশ্বরের কথা স্মরণ করে। ভবতারিণীর আকর্ষণ প্রতিনিয়তই মনকে মন্দিরের মাঝে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঘুমের আধোঘোরে

একদিন দেখলেন মন্দিরের ঘাটে তিনি বসে আছেন আর রানী যেন চিরকালের মত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। ঘুম ভেঙে গেল। মন অসম্ভব চঞ্চল। ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর দু'চারদিনের মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে একটি শুভদিন দেখে যাত্রা করলেন দক্ষিণেশ্বর। যাত্রার পূর্বে মায়ের পদধূলি মাথা পেতে ভক্তিভরে গ্রহণ করে, মায়ের মনের সব দুর্ভাবনা নানা কথায় ঘুচিয়ে দিয়ে গেলেন।

পুণ্যাত্মা রানী রাসমণি বার্ধক্যের কোঠায় উপনীত। রোগ একটা না একটা প্রায়ই লেগে আছে। ঠাকুরের দীর্ঘ অনুপস্থিতি মনকে বেশ কিছুটা বিচলিত করেছে; ভাবছেন, 'বছর কেটে গেল, এখনও ঠাকুরের আসার নাম নেই, কি জানি বাড়ীতে কি ভাবে আছেন!' মথুরকে ডেকে বললেন, ঠাকুরের খবরটা তাড়াতাড়ি একবার নিতে। শেষে এলোমেলো নানা দুশ্চিন্তার ভারে মনকে বোঝাই করে ছুটে এলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে—ইহকালে শেষবারের মত তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত মহাতীর্থ দর্শন আকাঙ্ক্ষায়। এসেই সর্বত্র একবার ঘুরে দেখলেন—যেমন বরাবর দেখে থাকেন। হৃদয় ও হলধারী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বেশ ভাল করে মন দিয়ে বিগ্রহের পূজা করেন। সব কর্মচারীরাই মন্দিরসংশ্লিষ্ট যার যার কাজে বিশেষ উৎসাহী ও তৎপর। ঘুরে দেখে রানীর তবুও মনে হল নাটমন্দিরে, চাঁদনিতে, ঘাটের পথে, উদ্যানের চারপাশে, পঞ্চবটীর তলায়, সর্বত্র যেন খাঁ-খাঁ করা একটা শূন্যতা, অথচ ছোট ভট্‌চাজ থাকলে ভক্তির আবেগে প্রাণ-কাঁদান তাঁর মা-মা ডাকে সর্বত্র সর্বদা সাড়া জাগত। এই মন্দিরে বসে মায়ের গান গেয়ে প্রাণ মাতিয়ে তুলেছেন। আবার পরক্ষণেই পঞ্চবটীর মূলে ধ্যানমগ্ন, নিশ্চল যেন পাথরের মূর্তি। মন্দিরে ভবতারিণীকে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে উঠে, মুখের পানে তাকিয়ে চোখে তাঁর জল এল—এ যেন নিষ্প্রাণ, শুধুই

পাষাণ বিগ্রহ ; অথচ ছোট ভট্‌চাজ মন্দিরে থাকলে দেবীর মুখমণ্ডল সর্বদা থাকে সন্তানবাৎসল্যে ও প্রাণের স্পন্দনে চঞ্চল হাস্যময়ী। পূর্বের বহু কথা স্মরণ করে বুকের কান্না আরও উথলে উঠল, অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল। কেঁদে কেঁদে আপন মনে বললেন, 'মা, তোমার পূজারী সন্তানকে অতি তাড়াতাড়ি আবার তোমার কোলে ফিরিয়ে নিয়ে এস, চারিদিকে উজ্জ্বল হয়ে পরিব্যাপ্ত হোক তোমার অনন্ত মহিমা'।

ঠাকুর তুমি ফিরে এস। আমি ঠিক আজ বুঝতে পেরেছি—তুমি শুধুমাত্র আমার এ ক্ষুদ্র মন্দিরের নয়, তুমি ভবমন্দিরের বিশ্বমায়ের পূজারী। তুমি ফিরে এস। ঠাকুরের উদ্দেশে বললেন, 'বাবা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। সংসার থেকে চিরবিদায়ের আগে একবার তোমাকে দেখে যেতে চাই।'

দিনভর ঘুরে দিনের শেষে স্নান আহ্নিক সেরে ঘাটে এসে ঘরে ফেরার জন্য যখন উদ্‌গ্রীব হয়ে নৌকার অপেক্ষায় তখন সুরধুনীর দুই তীর ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন—তার বুকের সুরতরঙ্গ, আকুল উচ্ছ্বাসে ভাটার টানে সাগরের কোলে উত্তাল তালে ছুটে চলেছে।

কাণ্ডারী লহ তুলে,
তরীতে তোমার, কতকাল আর
বসে রব খেয়াকূলে।
নিবিড় আঁধার ভবপারাবার
পরপারে যাব, না জানি সাঁতার,
তরী লয়ে ত্বরা কর এসে পার
থেকো নাকো দূরে ভুলে।
তোমার করুণা লভেছি সদাই,
চাহিবার তাই আর কিছু নাই,
নিজেরে এখন নিবেদিতে চাই
কালী কল্পতরুমূলে।

তিরোধানের কিছুদিন পূর্বে রানী রাসমণি ভগ্নস্বাস্থ্য ও উদ্বিগ্ন মন নিয়ে তাঁর কালীঘাটের আদি গঙ্গাতীরস্থ বাসভবনে চলে এলেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে এ খবর কানে শোনামাত্র রানীকে দেখতে ও দেখা দিতে হৃদয়কে নিয়ে ছুটে গেলেন কালীঘাট। রানীর যত রকম দুর্ভাবনা ঠাকুরকে চোখে দেখামাত্র দূর হয়ে গেল। 'এসেছেন বাবা,' ঠাকুরকে দেখে আনন্দের আতিশয্যে তিনি কেঁদে ফেললেন, দুর্বল দেহ, চোখের জল তাই আর বাধা মানল না। ভক্তিভরে প্রণাম করে আসন পেতে দিয়ে, বাড়ীর সকলের কুশল প্রশ্নের পর শেষে বললেন, 'বাড়ীতে এতদিন গিয়ে ভুলে থাকতে হয়? এদিকে আমার যে ডাক এসেছে—চলে যাওয়ার প্রায় সময় হয়ে এল বাবা।' রাত অবধি ঠাকুর রানীর কাছে বসে থেকে, বহু গান একটির পর একটি গেয়ে ভক্তিরসে সিক্ত করে দিলেন রানীর প্রাণ। শেষে রাত্রি যখন প্রহরাতীত কালীঘাট থেকে নৌকাযোগে হৃদয়কে নিয়ে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বর।

সংসার ছেড়ে চিরবিদায়ের কয়েকটি দিন মাত্র পূর্বে আদি গঙ্গায় বড় একটি নৌকা আলোকমালায় সজ্জিত করে তার ভিতরে রানী রাসমণিকে বাড়ী থেকে এনে রাখা হল। সেদিন ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারী রাত্রি যখন এক ঘটিকা, তখন কালীধ্যান, কালীজ্ঞান, কালীপ্রাণ, চিরদিন কালীপদ অভিলাষিণী রানী রাসমণি কালীর পাদপদ্মে মিলিয়ে গেলেন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগের একটু আগে একবার মাত্র বলে উঠলেন, 'ওগো মায়ের কালরূপ চারধার আমার আলো করে রেখেছে। নৌকার আলোগুলি এবার তোরা নিবিয়ে দে না।' পরদিন সূর্যোদয়ের পরেই মথুরবাবু মন্দিরে চলে এলেন ঠাকুরকে এ খবর জানাতে। মথুরবাবুকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'যা বলতে এসেছ মথুর তা আমি জানি। যাওয়ার আগে আমাকে ডেকে তিনি জানিয়ে গেছেন।'

রানী ছিলেন স্বয়ং মহাশক্তির মহাতেজসম্ভূতা। পুণ্য দ্যুতিতে

প্রদীপ্ত পবিত্র আত্মার যেখান থেকে উদ্ভব ঘটেছিল সেখানেই লয় হয়েছে। জগতে এসেছিলেন মহাতীর্থ মহাকীর্তি স্থাপনার জন্য। বৈষয়িক জগতেও তাঁর কূটনৈতিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দু'দু'বার দুর্ধর্ষ ইংরেজ সরকারকে মামলার প্যাঁচে ফেলে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে। মাতাল গোরা বন্দুক নিয়ে বাড়ীতে চড়াও হয়ে, খড়্গাহাতে রানীর রণচণ্ডী মূর্তি দেখে, জান নিয়ে জানবাজার ছেড়ে ভয়ে পালিয়েছে। মানুষের যতদিন ধর্মের উপর থাকবে পরম ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রবল আকর্ষণ ততদিন এই মহীয়সী নারীর কীর্তিস্তম্ভ মাতৃমন্দির, দ্বাদশ শিব ও রাধাকান্তজীর মন্দির তাঁর পুণ্য স্মৃতি বহন করে মহাতীর্থরূপে বিরাজ করবে।

রানীর তিরোধানের পর দেবীর পূজার ভার নিজেই আবার ঠাকুর গ্রহণ করলেন। কিন্তু পূজায় মন নিবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল পূর্বের সেই দিব্যভাবের চরম উন্মাদনা; পূজা সাঙ্গ হলে মা-মা বলে দেবীর মুখে ভোগের প্রসাদ গুঁজে দেন— শেষে করতালি দিয়ে মা-মা বলে শুরু হয় আনন্দ নৃত্য; আর পরম তৃপ্তিতে প্রতিমার মুখেচোখে ফুটে ওঠে বাৎসল্যভাব। এইরূপে দিব্যভাবে প্রায়ই বিভোর হয়ে থাকেন। মুখে আনন্দময় দিব্যজ্যোতি, বুকখানি রক্তজবার মত প্রায়ই থাকে টকটকে লাল। ঔষধ প্রয়োগে এর আরোগ্য হতে পারে ভেবে কলকাতার তখনকার সেরা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে ডেকে এনে দেখান হল। তিনি ঔষধ দিয়ে গেলেন। নিয়মিত সেবন করায় রোগের একটুও উপশম হল না, উন্মাদনার জন্য মন্দিরের পূজার ভার আবার তখন হৃদয়রামকে গ্রহণ করতে হল। এই সময় আপন মনে গান গেয়ে ভ্রমণরত ঠাকুরের দেহে একদিন মথুরবাবুর পরমাশ্চর্য দর্শনলাভ হল! উদ্যান থেকে ঠাকুর যখন তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন তখন চোখের নিমেষে রূপের পরিবর্তন দেখলেন। এ যেন মন্দিরের ভবতারিণী। আবার পিছন ফিরে একটু দূরে গেলে তাতে যেন দেখলেন সর্বত্যাগী স্বয়ং শিব। প্রথম ভাবলেন, 'এ আমার চোখের ভ্রম। শেষে বার বার

দেখে নিজের চোখকে অবিশ্বাস করা আর সম্ভব হল না। একেবারে নিকটে এসে ঠাকুরের পা দুটি জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ঠাকুর, তুমি কে আমাকে বল? তোমার প্রকৃত রূপ আমি আজ দেখতে পেয়েছি।' ঠাকুর এভাবে তাঁকে বিচলিত দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আহা ওঠ না, রানীর জামাই তুমি। পথের মাঝে এভাবে আমার পা ধরে কাঁদতে দেখলে লোকে কি ভাববে বল তো?' মথুরবাবু পা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবেগভরে ঠাকুরকে বললেন, 'আপনমনে এ পথ দিয়ে এদিক ওদিক তুমি গান গেয়ে চলেছিলে। এ দু'টি চোখ স্পষ্ট তখন দেখেছে, তুমি একবার শিব, একবার কালী। দু'একবার মাত্র নয়—বার বার। একবার সে মূর্তি করুণাঘন; তাতে শিবের ত্যাগবৈরাগ্য; আবার তাতে ভবতারিণীর সন্তানবাৎসল্যের পূর্ণ প্রকাশ। আমার কোন সন্দেহ নেই, মন্দির ছেড়ে শিবকালী তোমাতে মূর্ত হয়েছে। যে সত্য আমার কাছে আজ ধরা পড়েছে মঙ্গলময়ী মায়ের ইচ্ছায়, জগতের চোখে তা একদিন ধরা পড়বে। মানুষ সেদিন মন্দির গড়ে তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবে। লোকশিক্ষার জন্য জগতে যাঁরা আসেন লোকচক্ষে পরে তাঁরা দেবতা হয়ে যান।' শুনে ঠাকুর বললেন, 'কই আমি তো এ সবের কিছুই জানি না;'

ভবে এসে পাগলা ভোলা
খেল গরল সুধা ত্যজে।
শিবকালী তার বুকের মাঝে
রূপ ধরে তাই রাজে।
লাগে ভাবের দোলা প্রাণের তারে
ভোলা হারিয়ে ফেলে আপনারে,
শেষে ভাবের ঘোরে ঘুরে বেড়ায়
সারা সকাল সাঁঝে।

আঁধার হৃদগগনে উদয় তখন
লক্ষ তারার মাণিক রতন,
আর ভাবের ঘোরে পাগলা ভোলার
মন বসে না কাজে।
শেষে আছাড় খেয়ে মা-মা বলে
বুক ভেসে যায় নয়নজলে,
তখন ভক্ত দেখে শিবকালীরূপ—
ঐ পাগলা ভোলার মাঝে।

শুধু কি শিব আব কালী, রঘুবীর ও রামলালার সাধনায় যথাক্রমে সত্যরূপে রাজা রামচন্দ্র ও বাৎসল্যভাবে মাতা কৌশল্যা তাতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সাধনায় প্রেম ও ভাবাবেশে রসময়ী শ্রীবাধিকা। বেদান্তমতে ঈশ্বর সাধনায় নির্বিকল্প সমাধিতে, আত্মারাম পবমানন্দে সচ্চিদানন্দ সাগরে বিচরণ করেছে। কথামৃতেব ধারায় ধারায় হৃদয় হতে তখন উৎসারিত হয়েছে পুরাণ, বাইবেল, কোরাণের সারমর্ম—ঈশ্বরসত্তার জাগ্রত সত্য চিরশাশ্বত বেদমন্ত্র।

সেদিন থেকে মথুরবাবু ঠাকুরকে নরদেহে একত্রে শিব-দুর্গা জ্ঞানে পূজা করে এসেছেন। সেদিন থেকে ঠাকুরকে অদেয় তাঁর কিছুই ছিল না। কিন্তু দুঃখ এইখানে, কোন কিছু দেওয়ার প্রস্তাব তাঁর কানে তুললেই বিরক্তি প্রকাশ করে মারমুখো হয়ে উঠতেন।

আরও কিছুদিন এভাবে কেটে যাওয়াব পর নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে একদিন এসে উপস্থিত হলেন এক ভৈরবী। ঠাকুর বাগানে তখন ফুল তুলতে ব্যস্ত। ভৈরবীকে দেখেই ঠাকুর হৃদয়কে ডেকে বললেন, 'ওকে আমার ঘরে নিয়ে যা। একটু পরে আমি আসছি।' একটু পরে ঘরে ঢুকেই ঠাকুর ভৈরবীকে প্রণাম করলেন। 'তোমার সকল ইচ্ছা মঙ্গলময়ী মা পূর্ণ করুন,' এই বলে

ঠাকুরের মাথায় হাত রেখে ভৈরবী তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। তখন ঠাকুর, যখন যেভাবে থাকেন ভৈরবীকে সব বললেন। শুনে ভৈরবী বললেন, 'বাবা, এখানে তুমি আছ জেনেই তোমার কাছে এসেছি'। তন্ত্র ও বৈষ্ণব উভয় সাধনাতেই পরমসিদ্ধা ছিলেন এই ভৈরবী। ঠাকুরকে বার বার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে উৎসাহভরে বলে উঠলেন, 'বাবা, তুমি তো পূর্বেই স্বয়ংসিদ্ধ। তবুও আমার নিকট আবার দীক্ষিত হয়ে তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর।' প্রথমে ঠাকুর ভৈরবীর কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। দীক্ষিত হওয়ার পর যে ভাবে যা করতে হবে, ভৈরবী কাছে থেকে সব তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। ভৈরবীর সাহায্য ও সহযোগিতায় শাক্তমতে শুরু হল ঠাকুরের শক্তিরূপিণী মহাকালীর সাধনা। কিন্তু মহাকালী বহুকাল থেকেই তাঁর হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিতা। ভৈরবীর নির্দেশে রক্ত-চন্দনের দীর্ঘ তিলক ললাটে এঁকে, রক্ত বস্ত্র পরিধান করে মধ্যরাত্রির ঘোর অন্ধকারে বিধিমত মন্ত্রপাঠের পর মুণ্ডাসনে উপবেশন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালী করালিণীর লোল জিহ্বা যেন পূতাগ্নির সহস্র শিখা বিস্তার করে আসনের চতুর্দিক কুণ্ডলে ঘিরে ধরল। কুণ্ডলিনী মহাশক্তি সুষুম্নাপথে ক্রমে ঊর্ধ্বগামিনী। ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত, শরীর অসাড় নিস্পন্দ, ঠাকুর গভীর সমাধিতে নিমগ্ন।

জগদ্ধাত্রী মহামায়া শিবজায়া হে শঙ্করী,
যোগী হৃদি পদ্মাসনে যোগিনী পরমেশ্বরী,
দশ মহাবিদ্যারূপে রুদ্রত্রাসভয়ঙ্করী।
আদ্যাশক্তি সনাতনী সঙ্কটে ভয়তারিণী,
দশভুজা দুর্গা রূপে মহিষাসুরমর্দিনী,
অসুরসমরে মাতা রণদা প্রলয়ঙ্করী।
করালিণী কালী রূপে শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী,
চামুণ্ডারূপিণী ভীমা রক্তবীজবিনাশিনী,

রিপু বিঘ্ন নাশে রোষে অট্টহাসে দিগম্বরী।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু বরাভয় প্রদায়িনী,
সুখদা মোক্ষদা মাতা ধনধান্যে সুহাসিনী,
নমস্তে ভবতারিণী জগন্মাতা মহেশ্বরী।

ভৈরবীর সাহচর্যে এই ভাবে বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানি তন্ত্রের বিধিমত সাধনা করে প্রতিবারই সিদ্ধি লাভ করলেন। ভৈরবী দেখে আনন্দে আত্মহারা। এই সময় তাঁর দেহের অপূর্ব কান্তি ও উজ্জ্বল বর্ণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ করার পর ভৈরবী ঠাকুরকে বললেন, 'এখন তুমি বৈষ্ণবমতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাধনা কর। এ সাধনায় সর্বদা তোমাকে রাধার পরম ভাবে বিভোর হয়ে নিজেকে কখনও ভাবতে হবে শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবার দাসী, কখনও বা প্রিয় সখী ভেবে মনপ্রাণ সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করতে হবে।' দীক্ষান্তে ললাটে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা কাটলেন। সখী সেজে পরিধান করলেন শাড়ি ও বলয়। সর্বদা মনে করতেন, 'আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচরী, আবার কখনও বা চরণসেবার দাসী'। ভক্তি ও আবেগ-ভরে ভৈরবী তখন প্রেম ও বিরহের বহু গান গেয়ে গেয়ে ঠাকুরকে শোনাতেন। রাধার ভাবে বিভোর ঠাকুর মনপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করে অশ্রুসিক্ত নয়নে বসে বসে শুনতেন ঐ সব গানগুলি।

সখী এমন নিলাজ সাধনা,
রবে সারাদিন রাধা প্রেমডোড়ে বাঁধা
এমন বাঁশির কামনা।
বাঁশি বাজে প্রাণে সারা দিনমান,
আমার প্রেমযমুনায় বহে কলতান
সব ভুলে গিয়ে নিজেরে হারায়ে,
ডুবে থাক তাতে মনপ্রাণ।

বঁধু যুগ যুগান্ত সুর অনন্ত
রেখেছ বিশ্বে ছড়ায়ে,
কানে পশে যার, সে তো নাহি আর
সব যায় তার হারায়ে।
সখী কেমনে বুঝাব বঁধুব লাগিয়া
আমার প্রাণের যাতনা।

বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবের সাধনায় ব্রতী হয়ে ঠাকুরের দেহ আবার দিনের পর দিন ক্ষীণ হয়ে উঠল। আহারনিদ্রা প্রায় সম্পূর্ণ ত্যাগ, দিনরাত্রি কখন আসে কখন যায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ সেদিকে নাই। শেষে শুরু হল অসহ্য দাহ আর রোমকূপ থেকে বিন্দু বিন্দু রক্তাভ ঘাম নির্গমন। তবুও বিরামহীন চিন্তা ও ধ্যান, কখন তাঁর হৃদয়পদ্ম বিহারিণী শ্যামা, শ্যাম হয়ে হৃদয়কুঞ্জে সর্বদা বাঁশি বাজাবেন। দিব্য-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ দর্শন করতে সেই চিরকিশোরের চিরলীলা সঙ্গিনী পাগলিনী রাধিকার প্রেমময় ভাবে হৃদয় তখন তন্ময়। শেষে ভাবসমাধির দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে উজ্জ্বল নাগেশ্বরপুষ্পবর্ণা শ্রীমতীর একদিন উদয় হল। তার একটু পরেই অন্তর-যমুনা মুখরিত করে বেজে উঠল সেই চিরসুন্দর চিরশ্যামল বাঁশরিয়ার পাগল-করা বাঁশির সুর। হৃদিপদ্মে বিকশিত হল রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তি—প্রাণ জুড়িয়ে গেল। আবার সে রূপের ক্ষণিকের অদর্শনে প্রেমময়ী রাধিকার মতই প্রাণে বিরহের উন্মাদনা।

বঁধু কেন চল চঞ্চল চরণে,
আমি পথ চেয়েছিনু
জল ছল ছল নয়নে।
আমি তব রাধা জীবনের আধা
এক সাথে রব দু'জনে।

আজি মলয়ার মৃদু সমীরণ।
তুলে দিক মন আবরণ,
আর ঢাকিয়া রেখ না আমারে মায়ার বসনে
আমি ভুলে গিয়ে খেলা
কাটায়েছি বেলা, সারাদিন ফুল চয়নে।
আজি এ বাসনা মোর
ওগো মনচোর
নিশি ভোর হউক দু'জনে।

ভৈরবীর উপদেশ ও সাহচর্যে এইরূপ প্রেমময়ী রাধার ভাবে দিন-রাত বিভোর থেকে শ্রীকৃষ্ণ সাধনায় ঠাকুর সিদ্ধি লাভ করলেন। হৃদয় শান্ত হল কিন্তু দেহের জ্বালা-যন্ত্রণাব উপশম হল না। অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে গঙ্গায় নেমে গা ডুবিয়ে বাখতেন। শেষে ভৈরবী একদিন তাঁর শরীরে চন্দন লেপন করে গলায় সুগন্ধ ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। এতেই তাঁর রোগের উপশম হল। তারপর একদিন ভৈরবী মথুববাবুকে দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিতদের সভা বসিয়ে ঠাকুবের দেহের অনেকগুলি লক্ষণ তাদের দেখিয়ে দিয়ে আর শাস্ত্রোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করলেন যে, 'ঐশী শক্তির স্বয়ং বিকাশে ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের মতই মনুষ্যজাতিকে নতুনের পথ দেখাতে ধরায় এ যুগে অবতীর্ণ।'

১৮৬৫ সাল, তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ করাব পব ঠাকুর কামারপুকুর থেকে বৃদ্ধা মা চন্দ্রমণিকে নিয়ে এসে মায়েব সেবা ও পরিচর্যার ভার সম্পূর্ণ নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। আর ছেলের কাছে থেকে মায়েরও ছেলের জন্য সব দুর্ভাবনা দূব হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠেই সব কাজের আগে ঠাকুর মাকে গিয়ে প্রণাম করতেন। এই সময়েরই কিছু আগে অথবা পরে দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভাব ঘটল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের

পরমভক্ত জটাধারীর। এসেই তিনি একটি ছোট বিগ্রহের পূজা ও সেবার ভার ঠাকুরের হাতে অর্পণ করলেন। বিগ্রহটির নাম রামলালা (অর্থাৎ বালক শ্রীরামচন্দ্র)। ঠাকুর তখন শ্রীরামচন্দ্রের মাতা রানী কৌশল্যার বেশ ধারণ করে সন্তানবাৎসল্যের মহাভাবে আর একবার শ্রীরামের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন।

এইভাবে বৈষ্ণব ও শাক্তমতের প্রতিটি পথে সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর দক্ষিণেশ্বরে একদিন এসে উপস্থিত হলেন অদ্বৈতবাদী পরিব্রাজক যতিরাজ শ্রীশ্রীমৎস্বামী তোতাপুরী পরমহংস। স্বামীজী ছিলেন পঞ্জাবের অধিবাসী। সর্বতীর্থ পর্যটন করে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। গঙ্গার ঘাটের উপর ঠাকুরকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে অতি নিকটে এসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে বার বার তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন, শিশুর মত অতি সরল নিষ্কাম, নিষ্পাপ পবিত্র সুন্দর ঠাকুরের ভাবময় মূর্তি। ঠাকুর সাধুকে দেখেই উঠে এসে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন— সাধু সন্ন্যাসী দেখলে আবাল্য যেমন করে থাকেন। যতিরাজ ঠাকুরের মস্তকে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেদান্তের শিক্ষা লাভ করে সন্ন্যাসী হবে ?' 'দীক্ষা নিয়ে বেদান্তমতে সাধনা করব, সন্ন্যাসী হতে পারব না বাবা।' আমার মা বেঁচে আছেন। তাঁকে ছেড়ে চলে গেলে তিনি বড় দুঃখ পাবেন। শুনে যতিরাজ যোগলব্ধ তাঁর তীক্ষ্ণ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলেন সম্পূর্ণ ভোগবাসনামুক্ত নিষ্কাম এই যোগীর সরল প্রাণের নিবিড় অন্তরাল। মুখে বললেন, 'বেশ তাই হবে'। বেশী আর কালক্ষেপ না করে ঠাকুরকে মন্ত্রশিষ্য করে বেদান্ত-বিধিমত শিক্ষা ও উপদেশ দিয়ে নিরাকার ব্রহ্মের যোগসাধনায় ব্রতী করলেন। প্রথমেই উপদেশ দিলেন মনকে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে। যোগাসনে বসে মন তারপর সব কিছুই অতি সহজে অতিক্রম করে উর্ধ্বে উঠে গেল। কিন্তু স্থিতি লাভ করল যেখানে সেখানে সাধনার ধন চিরপরিচিত চিদঘন মাতৃমূর্তি। বার বার এরূপ হওয়াতে নিরাশ হয়ে ঠাকুর তোতাপুরীকে বললেন, 'না আমি কিছুতেই

পারলুম না। নিরাকার ব্রহ্মের যোগসাধনা কিছুতেই আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।' 'শুনে তোতাপুরী তীক্ষ্ণ একখণ্ড কাঁচ এনে কপালের নিম্নে দুই ভ্রূর মাঝখানে ঠুকে দিয়ে বললেন, 'মনকে এই বিন্দুতে গুটিয়ে এনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যোগে প্রবৃত্ত হও'। গুরুর উপদেশে দৃঢ় সংকল্প লয়ে মহামায়ার চিদঘন মূর্তিকে অতিক্রম করে মন তুরীয়ানন্দে অসীম উর্ধ্বে উঠে সচ্চিদানন্দ মহাসাগরে ডুবে গেল। তিনদিন তিনরাত সম্পূর্ণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর গুরু চিন্তিত হয়ে কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করে চেয়ে দেখেন—নিশ্চল নিস্পন্দ, অথচ জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল—এ যেন শিল্পীর খোদাই-করা পাথরের অতি সুন্দর দেবমূর্তি। গুরু বিচলিত হয়ে শিষ্যের কানের কাছে 'ওঁ হরি' বারবার উচ্চারণ করায় চেতনা বাহ্য জগতে ফিরে এল। শিষ্যের এইরূপ নির্বিকল্প সমাধিতে গুরুর মন তখন পরমাশ্চর্যবোধে ভাবে অভিভূত। যতিরাজ সাধনার এই স্তরে পৌঁছতে একাদিক্রমে তাঁর জীবনের চল্লিশ বছর নর্মদাতীরে অতিবাহিত করেছেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এরপর শিষ্যের কাছে অনেকদিন কাটিয়ে গেলেন—ভূষিত করলেন প্রাণাধিক শিষ্যকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামে। হংস যেমন জলমিশ্রিত ক্ষীর থেকে জলের ভাগ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ করে, এই মহাপুরুষও তেমনি সংসারে বাস করেও যা কিছু সংসারের অসার বস্তু সব ত্যাগ করে শুধু সারবস্তু গ্রহণ করেছেন। কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে বাস করার পর শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব তোতাপুরীকেও বিলক্ষণ অভিভূত ও প্রভাবিত করেছিল। বহুদিন নির্বিকল্প সমাধিতে ঠাকুর ডুবে থেকে জগদম্বার ইচ্ছায় আবার ভাবজগতে ধীরে ধীরে ফিরে এলেন।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় অন্তরে তখন তাঁর আর এক নতুন প্রশ্নের উদয় হল। মুসলিম ভাইয়েরা মসজিদে গিয়ে হজরৎ মহম্মদ ও কোরাণের প্রদর্শিত পথে যে আল্লাহ্ পয়গম্বরের উপাসনা করেন আর খ্রীস্টান ভাইয়েরা যে ঈশার প্রদর্শিত পথে বাইবেলের নির্দেশে গীর্জায় বসে

পরম পিতা এক ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁরা কি সত্যিই বিভিন্ন, না অভিন্ন, একই পরমব্রহ্ম মহাশক্তিসম্ভূত। এরূপভাব মনে উদয় হওয়া মাত্র সুফী সম্প্রদায়ের গোবিন্দ রায় নামে মুসলমান এক ফকির এসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। অতি ভক্তিভরে ঠাকুর তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে, পোষাক-পরিচ্ছদে ও আহারে নিজেকে মুসলমান মনে করে বিধিমত নামাজ পড়ে আল্লাহর উপসনায় ব্রতী হলেন। এভাবে তিনদিন উপাসনার পর তাঁর দিব্যচক্ষুর সম্মুখে শ্মশ্রুমণ্ডিত এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের উদয় হল। কিছুক্ষণ সে মূর্তি তাঁর চোখের সম্মুখে স্থিতি লাভ করে আবার ধীরে ধীরে সগুণব্রহ্মে মিলিয়ে গেল। মহম্মদ প্রচার করেছিলেন একেশ্বরবাদ। বেদের সগুণ নিরাকার ব্রহ্মদর্শন ও ইসলামের ধর্মতত্ত্ব মূলত এক এবং অদ্বিতীয় মহাসত্য থেকে উৎসারিত।

শ্রীঠাকুরকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন যদুনাথ মল্লিক নামে দক্ষিণেশ্বরের এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। তাঁর বাড়ীতে একদিন বেড়াতে গেলে শ্রীঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল বারান্দার দেওয়ালে টাঙান ঈশাকে কোলে করা অবস্থায় মাতা মেরীর অপরূপ একখানি তৈলচিত্র। অন্তরলোকে জেগে উঠল প্রেমময় ঈশার ক্ষমাসুন্দর জীবনালেখ্য।

ভাবাবেশে তন্ময় চিত্তে ঠাকুর ওখানেই সমাধিস্থ হলেন। সমাধিভঙ্গ হলে কালীবাড়ীতে ফেরার পর ঈশামসির ধ্যানে মন তন্ময় হয়ে রইল। দু'দিন এভাবে কেটে যাওয়ার পর তৃতীয় দিন অধীর চিত্তে পঞ্চবটীমূলে যখন পদচারণা করছিলেন তখন দেখলেন সৌম্য উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দূর থেকে অতি ধীর পদক্ষেপে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। সেই দেবমানব আরও অতি কাছে এগিয়ে এসে ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে ধরা দিলেন। পৃথিবীর ক্রুর হিংসার ক্রুদ্ধ উন্মত্ত তাণ্ডবে ক্রুশবিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত তাঁর সর্বদেহ। তবুও সকলের মঙ্গলসাধনায় ক্ষমাসুন্দর মুখমণ্ডলে নয়নযুগল করুণায় ঢল ঢল ও সজল। প্রেমের হাসিতে সহসা ভুবন মুখরিত

করে ঠাকুরের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে একাত্ম হয়ে মিশে রইলেন। ঠাকুরের মন তখন তূরীয়ানন্দে ঊর্ধ্বে উঠে নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন।

হে অনন্ত ব্রহ্ম
মিলে আছ প্রেমে বিশ্বনিখিলে
অপরূপ রূপ সাজে,
কালিমার গায় তারায় তারায়
রূপের মাধুরী রাজে।
দূর হতে শুনি তব প্রেমগান,
তটিনীর বুকে বাজে কলতান,
মিলেছে রঙ্গে সুরতরঙ্গে
সাগরের হিয়া মাঝে।
ভুবনভবন মুখরিত গানে,
ভেসে আসা সুর সঙ্গীততানে—
ভ্রমর গুঞ্জে কুসুমকুঞ্জে
পরাণে বাঁশরি বাজে।
তোমা হতে যারা লভি মহাজ্ঞান
মর্ত ধূলিতে নিবেদিল গান
প্রাণ দিল তবু রেখে গেল দান
জগতের শুভ কাজে।

এছাড়া গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর তীর্থঙ্কর, শিখগুরু নানক এঁদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরজ্ঞানে ঠাকুর ভক্তি ও পূজা করতেন। তাঁদের প্রত্যেকের মতকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পথ বলে ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন। সাধনাবলে এইভাবে বার বার ঠাকুরের সমাহিত চিত্ত ঐশ্বরিক প্রকৃত যে তত্ত্ব ও সত্তাকে প্রত্যক্ষ করল তা হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান—পৃথিবীর

কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই একার নয়, তা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের।

তখন পুরাতন আর্যঋষিবর্ণিত বেদের ঐশী তত্ত্বের অমৃতময় মহাসত্য গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

হিন্দু বৌদ্ধ জৈন পার্শী মুসলিম খ্রীস্টান,
সকলেব পথে মিলেছেন যিনি
তিনি এক ভগবান।

হে মানুষ! তাঁর কাছে সত্যই যদি তোমরা পৌছতে চাও তাহলে সত্যদ্রষ্টা মহাজনেরা যতগুলি পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন সবগুলিই সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার প্রকৃত পথ। সবরকম ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে মন দিয়ে একবার কান পেতে শোন এই মহাসাধকের হৃদয়বেদ হতে উৎসারিত মহামিলনেব মহামন্ত্র—'যত মত তত পথ'। কিন্তু হায় পরম দয়াল পরমপিতা ঈশ্বর, তোমার অগণিত মানবসন্তানগণ কখনও কি এই পরম সত্যের কণামাত্র উপলব্ধি করেছে? যদি করত তাহলে স্বার্থ ও ভেদবুদ্ধিপ্রসূত ধর্মের লড়াইয়ে দেশ বার বার রক্তস্রোতে ভেসে যেত না, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নারী, শিশু ও বৃদ্ধের ক্রন্দনরোলে কেঁপে উঠত না পৃথিবীব অন্তরাত্মা, তাণ্ডবজনিত ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে সর্বদা আচ্ছন্ন, বিষাক্ত, কাল হয়ে থাকত না পৃথিবীর আকাশবাতাস।

"ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বাবে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল, 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে॥"

তুমি বহুরূপ ধরে হাসিতে বাঁশিতে
সাকার ও নিরাকারে—
কতদিন কত বাজাইলে সুর
মনের বীণার তারে।
যত কানে আসে সুরঝংকার
মরমে প্রবেশি কহে বার বার,
কেহ নহে পর, ভাই আপনার
ভালবাস সকলেরে।
প্রাণে কারও তবু জাগে না তো সাড়া,
প্রতিদিন বহে রুধিরের ধারা,
কেঁপে ওঠে ধরা ক্রন্দনরোলে
বুকফাটা হাহাকারে।

৩

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রমাগত এভাবে প্রতিনিয়ত নানা মতের সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটল কিন্তু দেহ দুর্বল হওয়ায় স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। বর্ষা তখন প্রায় সমাগত। গঙ্গার ধারে বর্ষাকালে রোগ আরোগ্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই ভেবে মথুরবাবু নিত্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিস সঙ্গে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে কামারপুকুরে পাঠিয়ে দিলেন; সঙ্গে গেলেন মা চন্দ্রমণি, ব্রাহ্মণী ভৈরবী এবং হৃদয়রাম। বাড়ীতে পৌঁছে লোক পাঠিয়ে জয়রামবাটী থেকে সারদামণিকে নিয়ে আসা হল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি দীর্ঘ সাত বছর পরে আবার মিলিত হলেন। অতি সমাদরে ঠাকুর পত্নীকে গ্রহণ করলেন। তিনি তখন আর একেবারে ক্ষুদে বালিকা নন—চতুর্দশ বর্ষীয়া কিশোরী। ঘরকন্নার

যত কিছু কাজ নিপুণ হাতে অতি যত্নে তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। তাঁর রসাল রসিকতায় পাড়ার সমবয়সীরা তো বটেই মাঝে মাঝে বৌঠান রামেশ্বরের স্ত্রী ও সারদামণি দু'জনেই হাসির তোড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। গ্রামের অনেক লোক অনেক রকম কথায় দুশ্চিন্তায় সারদামণির মনকে পূর্বে ভারি করে রেখেছিল, কাছে থেকে সব রকম দুশ্চিন্তা কেটে গেল। কিন্তু বাড়ীতে ঠাকুরের এমত ভাব, বিশেষ করে পত্নীর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা, ভৈরবীর মোটেই ভাল লাগল না। রেগে গিয়ে ঠাকুরকে একদিন বলে বসলেন, 'তোমার পতন হবে'। ঠাকুর শুনে হাসলেন। শেষে ভালভাবে আরও লক্ষ্য করে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভৈরবী ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে কামারপুকুর ছেড়ে কাশী যাত্রা করলেন।

হৃদয়ের বড় ইচ্ছা নিজ গ্রাম শিহরে মামাকে নিয়ে একবার বেড়িয়ে আসেন। পাল্‌কি চড়ে সেখানে যেতে যেতে বর্ষায় ডুবু-ডুবু পল্লীর মাঠঘাটের অপরূপ সৌন্দর্য বিশেষ করে ভাবের পথে ঠাকুরের মনকে প্রভাবিত করল। ক'দিন বেশ আনন্দে ওখানে কাটিয়ে আবার দু'জনে কামারপুকুরে ফিরে এলেন। সাত মাস সকলের সঙ্গে আনন্দে কাটিয়ে ১৮৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর হৃদয়রাম ও মাকে নিয়ে আবার যাত্রা করলেন দক্ষিণেশ্বরে। বধূ তখন কান্নার অশ্রু গোপন করে, হাসিমুখে শাশুড়ির ও স্বামীর পদধূলি ও আশীর্বাদ নিয়ে আরও ক'দিন কামারপুকুর কাটিয়ে চলে গেলেন পিত্রালয় জয়রামবাটী।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসেই ঠাকুর দেখলেন শতাধিক লোকজন সঙ্গে নিয়ে মথুরবাবুর সস্ত্রীক তীর্থযাত্রার আয়োজনের আদিপর্ব প্রায় সমাপ্ত। আর মথুরের জিজ্ঞাসার অপেক্ষায় না থেকে আনন্দে আত্মহারা ঠাকুর বললেন, 'আমাকেও নিয়ে চল, আমিও যাব'। এ পথে এ কাজে ঠাকুরের সঙ্গ পরম সৌভাগ্যের একথা আগেই মথুরের মনে উদয় হয়েছে। তাই অতি উৎসাহে বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই

আপনি তো সঙ্গে যাবেনই, এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা। তখনই বন্দোবস্ত পাকা হল। ঠাকুর যাবেন আর সর্বদা তাঁকে সামলে রাখার দায়িত্ব নিয়ে হৃদয়রামও সঙ্গে যাবেন। যাত্রার দিন ঠিক হল ১৮৬৮ সালের ২৭শে জানুয়ারি।

যাত্রা করে সকলকে নিয়ে দেওঘরে একদিন থাকতে হল। কিন্তু একটু পরে ঠাকুর সবার অলক্ষ্যে আপন মনে কোথায় যে চলে গেলেন তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না। এদিকে তিনি বাইরে বেরিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে এমন এক দরিদ্র পল্লীতে ঢুকে পড়েছেন যেখানকার মানুষগুলি না খেয়ে খেয়ে অস্থিচর্মসার। ছেঁড়া গামছা কারও পরিধানে একখানা আছে, কেউ বা অতিকষ্টে লজ্জা নিবারণ করেছে শতচ্ছিন্ন আধখানা মাত্র বস্ত্র দিয়ে। খুঁজে যখন ঠাকুরকে পাওয়া গেল তখন তিনি অসম্ভব বিচলিত, চোখে জলের ধারা। ধরা গলায় বললেন মথুরবাবুকে, 'এই সব নিরন্ন শিবের পূজা ফেলে কি পুণ্যিটা তোমার হবে শুনি আমাদের নিয়ে কাশী গিয়ে?' মথুর বুঝলেন এদের দেখে বাবার মন কেঁদে উঠেছে, তবুও বললেন, 'এত লোকের সেবা করতে অর্ধেক টাকা এখানেই যে নিঃশেষ হবে বাবা!' রেগে গিয়ে ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তবে তোরা যা শালারা, আমি তোদের সঙ্গে যাব না'। এরপর মথুরবাবু আরও একদিন দেওঘরে অপেক্ষা করে, ঐ পল্লীর সকলকে পেটভরে খিচুড়ি খাওয়ালেন, আর একখানা করে কাপড় দিলেন। সদলবলে তারপর ঠাকুরকে নিয়ে যাত্রা করলেন কাশীর পথে।

নৌকা যখন মনিকর্ণিকা ঘাটের সম্মুখে ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ বিশ্বনাথের মহিমোজ্জ্বল দ্যুতি ও বিভূতির শোভায় মণ্ডিত অপরূপ সাজে কাশী এসে যেন শ্রীরামকৃষ্ণের চোখের সামনে আবির্ভূত হল! 'জয় কাশী, জয় বিশ্বেশ্বর,' বলে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। নৌকার মধ্যে অতি সাবধানে হৃদয়রাম মামাকে আগলে রইলেন। সমাধিস্থ ঠাকুরের দিব্যচোখের সামনে ফুটে উঠল ঊর্ধ্বমুখী পিঙ্গল

জটাভারের অভ্যন্তরে গঙ্গোত্রীকে ধারণ-করা, শ্বেতবর্ণ, ত্রিশূলধারী রুদ্ররূপী যোগী বৈরাগী কাশী বিশ্বনাথের ভুবনভুলান মূর্তি। নৌকা ঘাটে এসে পৌঁছনর পর ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হল। অতি সাবধানে মামাকে নিয়ে হৃদয়রাম তীরে উঠলেন। কেদারঘাটের কাছে পর পর দু'খানা বাড়ী ভাড়া করে সকলেরই একসঙ্গে বাস করার ব্যবস্থা হল। কাশীতে এসে সর্বদাই ভাবসমাধির জন্য কেদার ও বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রায়ই ঠাকুর পাল্‌কি চড়ে যেতেন।

প্রথম দিন পাল্‌কি চড়ে মন্দিরে যেতে পথের দু'ধারে তাকিয়ে দেখলেন অসংখ্য কাঙাল জনতা—তারা সব অন্ধ-আতুর, নিরন্ন-ক্ষুধাতুর, কেউ বা অস্পৃশ্য কুষ্ঠরোগী, আবার কেউ বা রোগে-শোকে-দুঃখে জর্জরিত সমাজচ্যুত, কেউ বা পরিত্যক্ত অথবা বহিষ্কৃত। তারা কেউ বা দুঃখের জ্বালা জুড়াতে, কেউ বা নিরাশ্রয়, নিরুপায় হয়ে পেটের ক্ষুধায় বাঁচার পথ খুঁজে খুঁজে আর কোথাও স্থান না পেয়ে শেষে বিশ্বেশ্বরের পায়ের তলায় আশ্রয় নিয়েছে। ভোগের বিবিধ উপচারে যারা ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহের পূজা দিতে আসে ইচ্ছা হলে তাদের কেউ কেউ যৎসামান্য কিছু এদের দিয়ে যায়। অধিকাংশই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। সর্বত্যাগী শ্মশানচারী যোগী মন্দিরের ভোগ-ঐশ্বর্যের অন্তরালে কঠিন সোনার শিকলে আবদ্ধ। শ্রীঠাকুর মথুরকে এইসব পথচারীদের দেখিয়ে বললেন, 'সর্বত্যাগী শংকরের পরমসত্তা কোথাও যদি থাকে তবে আছে এদের ভিতরেই, মন্দিরে নয়। কাশীতে যখন এসেছ, এদের সেবা সাধ্যমত প্রাণ দিয়ে করে যাও। এভাবে পূজা করলে বিশ্বনাথ খুশি হবেন।'

জাগ সত্য সুন্দর শিব
মানস শুভ মন্দিরে।
আশিস্‌ কর মঙ্গলকরে
এ মহাযুগসন্ধিরে।

এ কী অনল দাহ তাপ প্রদাহ
পাপ কলুষ দ্বন্দ্ব !
পাষাণ দেবতা অন্ধ থেক না
দুয়ার রেখ না বন্ধ।
ঘোর রক্তলালসা মত্ত পিপাসা
ধ্বংসের রচে ফন্দিরে।
উঠুক রণি ধ্বনি প্রণব
জ্যোতি প্রকাশ ভাস।
জাগ শঙ্কর হর হর হর
সন্ত্রাস ত্রাস নাশ।
ডুবে যাই চলে অথৈ অতলে
কঠিন শিকলে বন্দিরে।

ঠাকুরকে খুশি করতে মথুরবাবু তখন খাদ্য, অর্থ, বস্ত্র এদের সকলকে সাধ্যমত প্রচুর দান করলেন। দানের এই অভিনব দৃশ্যে কাশীর সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও মথুরবাবুর নামে অভূতপূর্ব সাড়া জেগে উঠল। এত দান ও সেবার পর মথুরবাবু ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার বলুন বাবা, আপনার কি চাই'। খুশি হয়ে ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে, দাও একটা কমণ্ডলু কিনে তাহলে'। ঠাকুরের চাওয়া শুনে মথুরের চোখ দু'টি জলে ভরে উঠল। কাশীতে আসার পরই ভৈরবীর সঙ্গে ঠাকুরের ও মথুরবাবুর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। তারপর দেবদেউল ঘুরে দেখার পথে পথে ভৈরবীও হয়েছেন ঠাকুরের প্রতিদিনের সাথী।

হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে একদিন দর্শন করে এলেন কাশীর তখনকার মনুষ্যদেহধারী শিব শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গস্বামীকে। পায়স রেঁধে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ; স্বামীজী পরিতৃপ্ত হয়ে তা ভোজন করলেন। এই ভবধামে দুই মহাপাগলের যেন বহুকাল পরে আবার

সহসা সাক্ষাৎকার। অনন্তকাল ধরে যেন দু'জনের পরিচয় এমনি ভাব। দু'জনেই প্রেমে-ভাবে-ভক্তিতে দিনভর বিভোর হয়ে রইলেন। তারপর সন্ধ্যা যখন সমাগত, বিদায় নিয়ে ঠাকুর পথে বেরিয়ে এসে হৃদয়কে বললেন, 'এতক্ষণ যা দেখে এলি, তাই-ই এ জগতে শিবের প্রকৃত রূপ'। এর দু'একদিন পরে ঠাকুরকে নিয়ে মথুরবাবু প্রয়াগে যাত্রা করলেন। দু'দিন মাত্র সেখানে বাস করে আবার ফিরে এলেন কাশীধামে। এরপর বৃন্দাবনযাত্রার আয়োজন শুরু হল।

সকলে একসঙ্গে একপক্ষের ভিতরেই মথুরায় পৌঁছে দর্শন করলেন মথুরার পরমতীর্থ ধ্রুবঘাট। যে ঘাট দিয়ে দেবকীর সদ্যপ্রসূত সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করে পিতা বসুদেব দুর্যোগময়ী নিশীথ অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে যমুনা অতিক্রম করেছিলেন। তারপর চলে এলেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের ধূলায় পা ফেলা মাত্র প্রেমময়ী রাধারানীর মহাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেমে আবার ভাবোন্মত্ত। কানে ভেসে এল ব্রজদুলাল রাখালিয়ার উদাস বাঁশির পাগল-করা মনভুলান চিরমধুর সুরলহরী। বহু যুগযুগান্তরের অন্তেও বৃন্দাবনের আকাশেবাতাসে এ সুর ভেসে বেড়ায়।

আমি হেরিনু বঁধুর মধুর মূরতি
কাজল মেঘের ফাঁকে।
বঁধু কত যুগ পরে মুরলী অধরে
নাম ধরে মোরে ডাকে।
বঁধু মুরলী বাজায়ে পাগল সাজায়ে
শেষে কেন ভুলে থাকে ?
কাল আঁধার গোকুল যমুনার কূল
ঘাটে নাহি খেয়াতরী।

আমি হারায়েছি কূল, হয়েছি আকুল
কেমনে যাব লো তরি।
তুমি পারের কাণ্ডারী,
(বঁধু হে, তুমি পারের কাণ্ডারী)
আমি তো তোমারি, কেমনে আছ পাশরি।

যার প্রাণ আছে সে কান পেতে শোনে, 'সখি কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—আকুল করিল মোর প্রাণ'। তারপর আর আপনাকে সম্বরণ করতে না পেরে সমাজসংসার সব ত্যাগ করে প্রেমে পাগল হয়ে ঐ বাঁশরিয়ার পায়ে করে আত্মসমর্পণ—যেমন করেছিল ব্রজের গোপগোপিনীগণ, যেমন করেছিলেন শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, রূপসনাতন, জয়দেব, চণ্ডীদাস, রামী, মীরাবাঈ, লালাবাবু, গঙ্গাবাঈ ও শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। অনন্ত কাল এ বাঁশি বাজবে। মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হবে না। যদি হয়, বিচিত্র এ সংসারও সেদিন বিলুপ্তির অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। বাঁশি এ পারে প্রেমময়, কিন্তু পরপারে মথুরায় প্রলয়ঙ্কর হয়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেছে। ধ্বংস করেছে নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজা কংসকে। পাঞ্চজন্যের ঘোর রবে প্রলয়রণতাণ্ডবে পাণ্ডবদের নাচিয়ে তুলে সবংশে ধ্বংস করেছে দুরাচারী কুরুবংশ। ধ্বংসের এই কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবানের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তখন ভগবদ্‌গীতা।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের কাছে মথুরবাবু বড় একখানি বাড়ী ভাড়া করলেন। ওখানে এসেই ঠাকুর এক বৈষ্ণব

বাবাজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে, মুক্তকচ্ছ হয়ে কৌপীন ও গোপী-বস্ত্র পরিধান করলেন। অতিরিক্ত ভাবাবেশের জন্য এখানেও ঠাকুরের পায়ে চলা সম্ভব হত না। পাল্‌কিতে চড়ে আসাযাওয়ার পথে পাল্‌কির দরজায় হৃদয়রাম সতর্ক দৃষ্টি রেখে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে চলতেন, —ভাবের ঘোরে মামা যাতে পাল্‌কি থেকে উল্‌টে গিয়ে বাইরে গড়িয়ে না পড়েন। দেখলেন শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড। গিরিগোবর্ধন দেখতে গিয়ে এক লাফে উঠে তার মাথায় চড়ে বসলেন। পাণ্ডারা ধরে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর নিধুবন ও গঙ্গাবাঈকে দেখতে গিয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ হলেন। শ্রীঠাকুরের এই মহাভাবে তাঁর মধ্যে শ্রীমতীর পূর্ণ বিকাশ দেখতে পেয়ে গঙ্গবাঈও ভাবাবিষ্ট হয়ে ঠাকুরের নাম রাখলেন দুলালী। শ্রীশ্রীগঙ্গাবাঈও রাধার ভাবে নিধুবনে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করতেন। ঠাকুরের সঙ্গলাভের পর এই উচ্চাঙ্গের সাধিকার প্রাণে সর্বদা ভেসে আসত সেই চিরকিশোর চিরশ্যামল বাঁশরিয়ার ব্যাকুল সুরলহরীর কলতান। এতে পরমাশ্চর্য বোধে চিরদিনের মত ঠাকুরকে তাঁর নিজের কাছে ধরে রাখতে চাইলেন।

ও কাল বাঁশরিয়ারে ভবে কেমন এ তোর বাঁশি!
সুরে কেউ বা ভাবে ভবঘুরে,
কেউ ভেবে হয় উদাসী।
এমনি তোর বাঁশরির গুণ,
প্রাণে জ্বালায় প্রেমের আগুন,
শুনে যে জন মজে, তোরে খুঁজি
ঘর ছেড়ে হয় পরবাসী।

তোর বাঁশির ডাকে সে যায় চলে,
পথের বাধা দু'পায় দলে,

কেন বুক ভাসে তার নয়নজলে
যে হয় সুরের পিয়াসী।

ভুলে যায় সে ভেদাভেদজ্ঞান,
সকল দেখে একই সমান।
হয়ে সাগরের বান প্রেমতরঙ্গে
মরা গাঙ্গে যায় ভাসি।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও গঙ্গাবাঈ শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে রাখতে পারলেন না। ঠাকুরের মনে পড়ে গেল মা ভবতারিণী ও মা চন্দ্রমণির কথা—কতদিন মা ওখানে একলা পড়ে আছেন। ঠাকুরের ইচ্ছায় মথুরবাবু বৃন্দাবনেও ভিক্ষুক ও বৈষ্ণবসেবায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। গয়া যাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু গয়া যেতে ঠাকুরের একান্ত অনিচ্ছা। তাই মথুরবাবুও এ ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। হৃদয়কে পাঠিয়ে নিধুবন থেকে ঠাকুরকে নিয়ে এসে চার মাস তীর্থপরিক্রমার পর কাশীতে ফিরে বাংলা ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সকলকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। দক্ষিণেশ্বরে পা দিয়েই ঠাকুর পঞ্চবটী ও তাঁর সাধন-কুটীরের চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন বৃন্দাবনের পবিত্র রজ। ঐ বছরের আশ্বিন মাসে মথুরামোহন ঠাকুরকে নিয়ে মহা ধুমধামে করলেন দুর্গোৎসব। ঠাকুরের তৃপ্তির জন্য ঠাকুরকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে প্রায়ই চলত মথুরামোহনের শিবজ্ঞানে অন্নবস্ত্রে দরিদ্রের সেবা ও মহোৎসব। আবার মাঝে মাঝে মথুরবাবু ঠাকুরকে তার জমিদারি দেখাতেও নিয়ে যেতেন। তখন নিরন্ন গ্রামবাসীদের চোখে দেখা মাত্র মথুরবাবুকে দিয়ে তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন। মথুরের চোখে তখন স্পষ্ট ধরা দিল নিরন্ন দরিদ্রদের প্রাণ দিয়ে সেবার মধ্যে ভগবানের স্বতন্ত্র একটি রূপ। কিন্তু তার অল্পদিন পরেই মথুরের জীবনের খেলা সাঙ্গ হয়ে গেল। মাত্র সাত আট দিন জ্বরে ভোগার পর ১২৭৮ সালের ১লা

শ্রাবণ মথুরামোহন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করে দিব্যধাম ৺ভবতারিণীর পাদপদ্মে মিলিয়ে গেলেন। ঠাকুর হৃদয়রামকে নিয়ে প্রায় প্রত্যহ মথুরবাবুকে দেখে আসতেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা দেখে পূর্বেই তিনি বুঝেছিলেন, মা এবার মথুরকে তাঁর নিজের কোলে তুলে নেবেন।

তখনকার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মথুরামোহন প্রথম জীবনে ছিলেন সম্পূর্ণ নাস্তিক ভাবাপন্ন। দেবদেবী ঈশ্বরে তিলমাত্র বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। কিন্তু বিবাহের পর রানীর জামাতা হয়ে, তাঁর ধর্মজীবনের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এলে তাঁর অলৌকিক চরিত্রমাধুর্য, জীবন তুচ্ছ করেও ব্রহ্মময়ীকে সাকার মাতৃরূপে লাভ করার জন্য অভূতপূর্ব সাধনা ও ঠাকুরের মধ্যে শিব-কালী দর্শন মথুরের মনকে আরও ভাবাবিষ্ট ও আকৃষ্ট করে। তারপর ক্রমে আকর্ষণ আরও প্রবল হওয়ায় ঈশ্বরজ্ঞানে ঠাকুরের প্রতিদিন সেবা করতেন। ঠাকুর সম্বন্ধে রাসমণির মনেরও ছিল ঠিক একই অবস্থা।

চার বছর গত হয়েছে, ঠাকুর কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছেন। এত দীর্ঘদিনের মধ্যেও আর একবার সেখানে ফিরে যাওয়ার তাঁর সুযোগ ও সময় হয়ে ওঠে নি। মা চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছেই থাকেন। সারদামণি আছেন জয়রামবাটীতে ; প্রয়োজন হলে সেখান থেকে মাঝে মাঝে কামারপুকুরে এসে থাকেন। অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে, এখন তিনি পূর্ণ যুবতী। গ্রামের লোক প্রায়ই কলকাতা ও দক্ষিণেশ্বরে আসে, ঠাকুরকে দেখে যায় ; সরদামণিকে গিয়ে বলে, 'জামাইকে দেখে এলুম, এখন একেবারে বদ্ধ পাগল। মন্দিরে আর পূজা করে না, গাছতলায় বসে কেবল মা-মা বলে বিড় বিড় করে। অথবা ঘাটে বসে চিৎকার করে কালীর গান গায়।' কেউ গিয়ে বলে, 'এবার দেখে এলাম একেবারে দড়িছেঁড়া বদ্ধ পাগল। তাই এখন ঘরে আটকা পড়ে আছে।' গ্রামময় রটে গেল রামচন্দ্র

মুখুজ্যের মেয়ে সারদার বর একটি আস্ত পাগল। এসব রাতদিন শুনতে শুনতে ক্ষোভে দুর্ভাবনায় আহারনিদ্রা ত্যাগ হল সারদামণির। অসহ্য যন্ত্রণাবোধে আর অপেক্ষা না করে পিতার সঙ্গে পদব্রজে যাত্রা করলেন দক্ষিণেশ্বরে। গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে সঙ্গী আরও ক'জন স্ত্রী-পুরুষ জুটে গেল।

জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরের দূরত্ব ষাট মাইল দীর্ঘ পথ, সবটাই পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হবে। অতি ভোরে উঠে একসঙ্গে সকলের যাত্রা শুরু হল। সন্ধ্যার পূর্বে আরামবাগ অতিক্রম করতে না পারলে ডাকাতের কবলে পড়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা। বিস্তীর্ণ মাঠের দু'ধারে ঘন জঙ্গল। রোদের প্রচণ্ড উত্তাপ মাথায় করে দিনভর জোর পায়ে হাঁটলেও পথের যেন আর শেষ নাই। সন্ধ্যা হয় হয়; সঙ্গীরা অনেক দূরে এগিয়ে যাওয়ায় এখন দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরে। কাঠফাটা রোদের পর আকাশের চারদিক ঘিরে নেমে এসেছে ঘুটঘুটে কাল অন্ধকার। চিৎকার করে সাথীদের ডেকে কারও কোন সাড়া পেল না; তারা সকলেই অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে সম্মুখের পথ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল। আতঙ্কে ও প্রবল জ্বরে সারদামণির সর্বশরীর তখন থর থর করে কাঁপছে। আর তাঁর পিতা ভগবানের ও মা দুর্গার নাম জপ করে ভয়ে শিউরে উঠছেন। তারপর মনকে শক্ত করে মেয়ের হাত ধরে, অতি কষ্টে নিকটে এক ছাউনিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। গিয়ে দেখেন, কিছুক্ষণ আগে সেখানে সঙ্গীরা পৌঁছে সবাই বিশ্রামরত। জ্বরের প্রবল উত্তাপে প্রায় অচৈতন্য হয়ে সেখানে পড়ে রইলেন সারদাদেবী। তাঁর শিয়রে সারারাত অতন্দ্র হয়ে জেগে রইলেন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভোর হওয়ার পূর্বেই জ্বর কমে এল। জেগে ওঠার পরই রামচন্দ্র মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন আছিস্ মা?' উত্তরে সারদামণি বললেন, 'জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম বাবা, অতি ছোট্ট একটি কাল মেয়ে কোথা থেকে ছুটে এসে আমার কাছে বসল। আমাকে কত আদর করে তার নরম হাত

হু'খানি আমার সারা গায়ে বুলিয়ে দিল। আমার গায়ের তাপ জুড়িয়ে গেল ও জ্বালা-যন্ত্রণা সব দূর হল। কাল অথচ কি অপরূপ সুন্দর দেখতে মেয়েটি। চমকে জেগে উঠে চেয়ে দেখি আর সে আমার কাছে নাই,—চলে গেছে। তুমি ভেব না বাবা, আমি এখন বেশ হেঁটে যেতে পারব।' কিন্তু হেঁটে যেতে আর হল না। ওখানেই পাল্কি একখানা জুটে গেল।

পরবর্তী কালে সারদামণি আর একবার হাঁটাপথে দক্ষিণেশ্বরে আসতে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রির কোলে মাঠের মধ্যে ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। কিন্তু সে ডাকাত ঘোর বিপদের কাঁটা হয়ে পায়ে বেঁধে নি। জবার মালা হয়ে পা হু'খানি জড়িয়ে ধরে নিরাপদে সারদামণিকে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিয়ে গেছে। সারদামণির পাল্কি পিতাকে সঙ্গে করে যথাসময়ে এসে পৌঁছল দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর কাছে এসে অভ্যর্থনা করে শ্বশুরকে নিজের ঘরে বসতে আসন পেতে দিলেন। হৃদয় ছুটে এসে মামীকে সাদর অভ্যর্থনা করে পাল্কি থেকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। পথে সারদামণির প্রবল জ্বরের কথা শ্বশুরের মুখে শুনে তৎক্ষণাৎ মাতুরের উপর তোষক চাদর বালিশ বিছিয়ে নিজের হাতে শয্যা রচনা করলেন। সারদামণিকে বললেন, 'তুমি এখানে শুয়ে পড়, ঠাকুরকে সুস্থ সবল স্বাভাবিক দেখে সারদামণির মনের সব হুঃখ গ্লানি হুশ্চিন্তা নিমেষে কর্পূরের মত উবে গেল। ক্ষণিক বিশ্রামের পর বাইরে এসে মন্দিরসংলগ্ন পরিবেশে ঠাকুরের ভাবময় মূর্তি ভালভাবে লক্ষ্য করায় শিশিরসিক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মের মত ঢল ঢল চোখহুটি প্রেম ও ভক্তিতে হয়ে উঠল সজল।

পূজারী খোল খোল মন্দিরদ্বার,
সাজায়ে এনেছি ডালি পূজা-উপচার।
প্রতিদিন ফুলকলি তোমার পূজার তরে,
ফুটে উঠি বেদনায় ম্লান হয়ে গেছে ঝরে,

আজ ভরা গঙ্গার কূলে,
হৃদয়কুসুম তুলে,
নিজ হাতে সঁপে দেব চরণে তোমার।

এ জনমে এই ভবে আর কিছু নাহি চাই
চরণসেবার তরে যদি কাছে মিলে ঠাঁই,
যখন যেখানে থাক,
আমারে চরণে রেখ,
এ জনমে এই শুধু কামনা আমার।

জামাইকে ক'দিন ভালভাবে লক্ষ্য করে সারদামণিকে দক্ষিণেশ্বরে রেখে রামকুমার মুখোপাধ্যায় নিজগ্রাম জয়রামবাটীতে ফিরে গেলেন। নহবতঘরে মা চন্দ্রমণির সঙ্গে সারদামণির সারাদিন থাকার ব্যবস্থা হল। রাত্রি অধিক হলে শয়ন করতেন এসে ঠাকুরের ঘরে। প্রায়ই ঠাকুর রাত্রে সমাধিস্থ হতেন। একটু পরে সে ভাব আপনি কেটে যেত। কিন্তু ঠাকুরের এভাব দেখে সারদামণি প্রায়ই ভীত ও চিন্তিত হয়ে উঠতেন। একদিন সমাধি কিছুতেই আর ভাঙে না, অত্যন্ত ভীত হয়ে বাইরে এসে হৃদয়কে তাঁর ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গেলেন। হৃদয় এসে কানের কাছে ওঁ শব্দ কয়েকবার মাত্র উচ্চারণ করামাত্রই ঠাকুরের ভাবসমাধি কেটে গেল। এরূপ ভাব হলে কানের কাছে ওঁ ধ্বনি উচ্চারণ করতে হয়। সাবদামণি তখন তা জেনে নিলেন। প্রতিদিন দেখে দেখে সারদামণির ভয়-ভাবনা শেষে কেটে গেল। দিনভর নহবতঘরের অন্তরালে বাস করলেও মন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ থাকত ঠাকুরের দিকে—কোথায় কখন কিভাবে তিনি থাকেন।

তখন বাংলা ১২৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। মন্দিরে ফলহারিণী পূজা, আর নিজের ঘরে পৃথকভাবে ঠাকুর করেছেন ষোড়শী পূজার

আয়োজন। রাত্রি হওয়া মাত্র নিবিড় কালিমা দক্ষিণেশ্বরের আকাশকে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে। সেই কালিমার দেহাভরণ অসংখ্য নক্ষত্র-দ্যুতি। মাঝে মাঝে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, আর সেই সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে ঢেউয়ের উত্তাল তাণ্ডব। রাত্রির প্রথম প্রহরে পূজারম্ভ। মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বাহির প্রাঙ্গণে নিবিড় নিস্তব্ধতাকে কেবলমাত্র মাঝে মাঝে ভঙ্গ করে ঠাকুরের ভক্তি-বিগলিত করুণ কণ্ঠের মা মা আর্তরব বাতাসে ভেসে চলেছে, পরপারে বহুদূর পর্যন্ত তা বিস্তীর্ণ। পূজার সময় যখন সমাগত তখন চলেছে অবিরাম গতিতে ঢেউয়ের চলচঞ্চল আনন্দ নৃত্য গঙ্গার বিশাল বক্ষ জুড়ে। ঘরের ভিতর রক্তবস্ত্র-পরিহিত দেবী ও পূজারী। ঠাকুর সারদামণিকে বললেন, 'শুদ্ধচিত্তে আলপনা আঁকা এই বেদীতে উপবেশন কর। তোমার পূজা হবে। সর্বদা সর্বত্র মায়ের আসনেই তোমার প্রকৃত স্থান।' নির্দেশমত মা সারদামণি যথাস্থানে উপবেশন করলেন। তারপর বিধিমত উদাত্ত কণ্ঠে নিশার স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে যোড়শাক্ষর মন্ত্রে শুরু হল শ্রীরামকৃষ্ণের যোড়শী মাতৃকার মহাপূজা।

জাগ নারায়ণী পরমা প্রকৃতি
কল্যাণী বরাভয়া রূপে।
জাগ শুদ্ধ ভক্তি মোহ বন্ধন মুক্তিরূপে।
জাগ সত্য প্রেম বৈরাগ্য ত্যাগ
শান্তি স্বরূপিণী রূপে।
জাগ নিরন্ন শিব সমাজে
মাতা অন্নপূর্ণা রূপে,
জাগ নিষ্কাম সেবাধর্মে
স্নেহময়ী মাতৃরূপে।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণময়ে গুণাশ্রয়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

পূজা শেষে শেষ অঞ্জলির পর দেখা গেল মায়ের সর্বাঙ্গে চন্দনের ছিটেফোঁটা, শিরে রক্তজবা। বেদীমূলে স্থাপিত পূজার ঘটে অঞ্জলি প্রদত্ত রাশি রাশি রক্তকমল। মা পাষাণ প্রতিমার মত স্থির অচঞ্চল। তারপর পূজারী ও দেবীর চিত্তসরোজ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন। দক্ষিণেশ্বরের সে মহাপূজার রাত্রি পূজার শেষে ফিরে পেল আবার নিবিড় নিস্তব্ধতা।

আকাশ ভুবন কালিমা মগন
অমা নিশীথিনী ঘোরা।
ডুবে রয় দূরে চন্দ্রতপন
ফুটে ওঠে কোটি তারা।
যেন ব্রহ্মময়ী সাজি রত্নাম্বরে,
সাধনসমরে অসীম অম্বরে,
পদে মহাকাল কালঘুম ঘোরে
ত্রিভুবন ঘুমে ভরা।
শেষে ব্রহ্মময়ী অসীম সন্তরে
বসেন যোগাসনে যোগীর অন্তরে,
শিব শিব নাম, জপে অবিরাম
ত্রিনয়নে প্রেমধারা।

যখন সমাধি ভঙ্গ হল নব-সূর্যোদয়ের রক্তিম কিরণে মন্দিরের চূড়া তখন অরুণাভ।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিমন্ত্রে সারদামণিকে দীক্ষিত করে তাঁর করে তুলে দিলেন মন্ত্রপূত জপের মালা। ঠাকুরের প্রদর্শিত পথে প্রত্যহের তপশ্চর্যার আগ্নেয় উত্তাপে ভোগবাসনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি চিত্ত হতে পুড়ে সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সাধনার উচ্চমার্গে ক্রমে স্থিতি লাভ করে পরমযোগী পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে পরমযোগিনী রূপে পরমা প্রকৃতি সারদামণি। এভাবে একটি বছর পূর্ণ করে জয়রামবাটীতে আবার কিছুদিনের জন্য চলে এলেন সারদামণি। এরপর বৃদ্ধা শাশুড়ি ও ঠাকুরের পরিচর্যার জন্য দক্ষিণেশ্বরেই থাকতেন; বছরে দু'একবার মাত্র, হয় কামারপুকুর নয়ত জয়রামবাটীতে, অল্পদিন থেকেই আবার চলে আসতেন দক্ষিণেশ্বরে। এভাবেই কেটেছে বহুদিন ধরে তাঁদের দাম্পত্য-জীবন, এর আগে পিছে পারিবারিক অতি গুরুতর শোকাবহ দুর্ঘটনা দু'একটি ঘটেছে। রামকুমারের পরে দক্ষিণেশ্বরে বসেই আবার খবর পেলেন তাঁর পুত্র রামঅক্ষয়ের অকাল তিরোধানের। তাঁর বয়স তখন মাত্র কুড়ি কি একুশ—বিবাহিত জীবন। বিষ্ণু মন্দিরের তিনি ছিলেন পূজারী। তাঁর পিতার মৃত্যুর পূর্বেই সূতিকাগৃহে তাঁকে রেখে তাঁর মায়েরও ঘটেছিল অকাল মৃত্যু। আশৈশব তিনি চন্দ্রমণি ও শ্রীরামকৃষ্ণের যত্ন ও লালনপালনেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। নিয়তির নির্মম বিধানে তাঁদের দু'জনেরই চোখের উপর মাত্র সাত আট দিন জ্বরভোগের পর নাবালিকা পত্নীর বুকে বৈধব্য ও দুঃখের জ্বলন্ত আগুন ঢেলে দিয়ে তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন। সংসারে যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, সাধারণ মানুষও প্রকৃতির নিয়মে শোক ভোলে, ক্ষত শুকায়; মনের এক কোণে পড়ে থাকে শুধু বেদনার স্মৃতি।

গঙ্গার স্রোতের মত দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে মহাকাল। এল বাংলা সাল ১২৮১, সারদামণি আছেন কামারপুকুরে, মা চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে। সহসা কামারপুকুর থেকে দুঃসংবাদ এসে উপস্থিত—

তাঁর মেজদা রামেশ্বর ইহজগতে আর নাই। ঠাকুর বালকের মত অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে চোখ মুছে আর এক মহাদুর্ভাবনায় পড়লেন—এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ কেমন করে তিনি অশীতিপর বৃদ্ধা মায়ের কানে তুলবেন! শুনে মাও আর বাঁচবেন না। আতঙ্কে ছুটে গেলেন তিনি ভবতারিণীর মন্দিরে। কেঁদে কেঁদে ভবতারিণীকে বললেন—'মাগো, মায়ের আমার এ দুঃখ তুই ভুলিয়ে রাখিস'। তা শুনে চন্দ্রমণি ঠাকুরকে বললেন, 'বাবা, এ দুঃখ তো আগেই পেয়েছি। জগতের চিরকালের এ নিয়ম—যার সময় যখন হবে চলে যাবে।' কত উদার কত মহৎ ছিল তাঁর মন, তার ব্যাখ্যা মথুরবাবু তাঁর জীবিতাবস্থায় করে গেছেন। ডাকতেন ঠাকুরমা বলে; ঠাকুরকে কিছু দিতে না পেরে তাঁর মনে বড় দুঃখ ছিল, তাই ভাবলেন ঠাকুরমাকে একটা তালুক লিখে দেবেন। মথুরের প্রস্তাব শুনে চন্দ্রমণি বললেন, 'ও সব আমি চাই না, ওতে আমার কি হবে!' শুনে মথুর বললেন, 'না ঠাকুরমা, তোমার ইচ্ছামত কিছু আমার কাছ থেকে চেয়ে নিতেই হবে'। শুনে চন্দ্রমণি বললেন, 'কি নেব, আমার তো সবই আছে, তবে হ্যাঁ, ছেলেকে বলতে ভুলে গেছি, দোক্তাপাতা ফুরিয়ে গেছে, তা এক পয়সার কিনে এনে দাও।' সেদিনও একথা শুনে মথুরবাবুর চোখদু'টি জলে ভরে উঠেছিল। আপন মনে শেষে ভাবছিলেন, 'এমন কামনা-বাসনা মুক্ত মা না হলে, তার পেটে কি এমন শিব জন্মে'।

রামকুমার, রামঅক্ষয় ও তারপর রামেশ্বরকেও হারিয়ে অতি বৃদ্ধা চন্দ্রমণির সারাদিন কাটত নহবতঘরে শুয়ে পড়ে থেকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে শেষে অতি কষ্টে গঙ্গার ঘাটে উঠে আসতেন। দেখতেন বসে বসে পারের অসংখ্য যাত্রী নিয়ে খেয়াতরীর এপার-ওপার নিরন্তর আসাযাওয়া। অন্ধকার হলেও বসে থাকতেন। ভাবতেন, 'আর কতকাল, আর কাতকাল পরে কাণ্ডারী, তোমার খেয়াতরী আমাকে পার করে নিয়ে যাবে'।

দয়াল মাঝি কি গান গাইয়া যাও,
আমার ঘাটে ভিড়াবানি তোমার সোনার নাও।
একলা ঘাটে বসে থাকি,
ঢেউ গুণি আর তুফান দেখি,
আমার ঘাটে ভিড়াইয়া নাও আমায় নিয়া যাও।
নাওখানি মোর আর চলে না—
পাল ছিঁড়েছে, হাল মানে না—
তাই তো ডাকি তোমায় দয়াল, আমার পানে চাও।
ওপার প্রেমে ঢলাঢলি,
চাঁদে মেঘে কোলাকুলি,
আমি কাঁদি এ পারেতে
আমায় ওপার করি লও।

আরও কিছুদিন এভাবে কেটে যাওয়ার পর ১৮৭৬ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি চন্দ্রমণির খেয়াপারের জন্য খেয়াতরীর ডাক এল। এ তরীতে তিনি তাঁর চিরবাঞ্ছিত ধামে পৌঁছে যাবার পর সন্ন্যাসী ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুধুমাত্র গঙ্গাজলে অতি নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে করলেন মায়ের পারলৌকিক তর্পণ।

৪

ইতিমধ্যে এই মহাপুরুষের নাম গঙ্গার এপার-ওপার অতিক্রম করে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। শুরু হয়ে গেছে কিছু কিছু তার্কিক, পণ্ডিত ও কয়েকজন ভক্তের সমাগম। যাঁরাই আসেন সবাইকেই ঠাকুর বলেন, 'ঈশ্বর লাভ করার এ-জগতে যতগুলি মত আছে সবগুলিই

প্রকৃষ্ট পথ, তর্কের কোন অবকাশ এতে নেই'। বিদ্যাবুদ্ধির শানিত অস্ত্রে আরও ভাল করে শান দিয়ে ঠাকুরের এই মত খণ্ডনের জন্য যাঁরা এলেন তাঁদের প্রতিটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর ঠাকুরের অতি সহজ সরল যুক্তিতেই মীমাংসা হয়ে যেত। কূট তর্কজাল অতি সহজ কথার যুক্তিতে ছিন্ন হওয়ায় পাণ্ডিত্যের দম্ভ ভক্তিতে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ত। আবার ধর্মনিষ্ঠ প্রাজ্ঞ মহান কোন ব্যক্তির নাম শুনলে প্রাণের আবেগে ঠাকুর নিজেই তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। কলকাতায় পদ্মলোচন স্বামী এসেছেন শুনে আকুল আগ্রহে ঠাকুর তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের আবেগভরা কণ্ঠে মায়ের গান স্বামীজীকে আনন্দলোকে পৌঁছে দিয়েছিল। গান সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর এবং স্বামীজী দু'জনেই হয়েছিলেন সমাধিস্থ। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরের ভক্তি ও উচ্চমার্গের জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে স্বামীজী আনন্দে অভিভূত হন।

ঠিক এই সময়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপদেষ্টা ও আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নাম বাংলাদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত যুব-সমাজের ছিল মুখে মুখে। ১৮৭৫ সালের ১৫ই মার্চ মা চন্দ্রমণির তিরোধানের প্রায় এক বছর পূর্বের এ ঘটনা—হৃদয়কে নিয়ে ঠাকুর ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে সহসা বেলঘরিয়ায় কেশবচন্দ্রের বাগানবাড়ীর আশ্রমের কাছে এসে উপস্থিত। কেশবচন্দ্র তখন তাঁর অনুগামী ব্রাহ্ম-শিষ্যদের নিয়ে ব্রহ্ম উপসনার জন্য প্রকৃতির এই রম্য নির্জন স্থানে বাস করতেন। ভক্তদের সঙ্গে কেশব স্নান করতে পুকুরের দিকে চলেছেন, সুতরাং গাড়ী থেকে ঠাকুরের নামামাত্রই উভয়ের সাক্ষাৎ হল। ঠাকুরের পরিধানে শুধুমাত্র একখানি ধুতি। লম্বা কোঁচার দিকটা শীর্ণ দেহে কাঁধের উপর ঝোলান; ধূলামাখা নগ্ন পা। হৃদয়রামের ধুতি-জামা-জুতা ঠিক সে যুগের রুচিসম্মত। ঠাকুরকে দেখিয়ে হৃদয়রাম কেশবকে বললেন, 'এই আমার মামা, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর প্রধান পুজারী—নাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। আপনি একজন পরম ঈশ্বরভক্ত লোক; আপনার নাম শুনে মামা তাই আপনার কাছে এসেছেন। মামা

ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে নানা কথা শুনতে ও বলতে ভালবাসেন।' শুনে কেশব বললেন, 'তা বেশ তো, বসুন এসে ; আমি স্নানে যাচ্ছি, স্নান সেরে আসি। বসে বসে তারপর এসব কথা হবে।' আশ্রমঘরে ঠাকুর ও হৃদয়কে বসতে দিয়ে কেশব ও তাঁর ভক্তগণ স্নান সেরে আবার তথায় এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর কালী কালী বলে যুক্তকরে কেশব ও উপস্থিত সকলকে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনেছি ধ্যানে বসে মহাশয়দের ঈশ্বরদর্শন হয়, তা কি ভাবে কেমন করে মনের কি অবস্থায় হয় ?' শুনে কেশব অতি সহজ সুরে ঠাকুরকে বললেন, 'মহাশয়, আশৈশব আমি প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের করুণাপ্রার্থী হয়েছি, তাতে আমার চিত্তলোকে আধ্যাত্মিক যে মহাসত্য আত্মপ্রকাশ করেছে তার আলোকসম্পাতে প্রত্যক্ষ করেছি আমি ঈশ্বর ও তাঁর বিশ্বরূপ। অসীম এই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমার ব্রহ্মের সত্তার উপলব্ধি হয়েছে। সগুণ ব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ; আর এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই আমার চোখে ঈশ্বরের মন্দির। সেথা হতেই প্রতিনিয়ত উৎসারিত হয় তাঁর প্রেমের ধারা। তাতেই প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য ও জীবজগতের ক্রমবিকাশ।'

পরবর্তীকালে মনুষ্যসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনন্ত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান চলল ; শেষে যোগ তপস্যা ধ্যান ও জ্ঞান হতে উদ্ভূত ঐশী তত্ত্বের মহা অবদান বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, বাইবেল, কোরান। কেশবের মুখে তাঁর দিব্য অনুভূতির বহু প্রসঙ্গ আগ্রহভরে শুনে ভাবাবিষ্ট চিত্তে কালী কালী বলে ঠাকুর গান শুরু করলেন।

"কে জানে মন কালী কেমন
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।"

গান আর শেষ হল না, তার পূর্বেই ঠাকুর সমাধিস্থ। সমস্ত দেহ অসাড়, বুক স্পন্দনহীন, কিন্তু মুখমণ্ডলের দিব্যত্যুতি তাঁর আসনের চতুর্দিকে যেন বিচ্ছুরিত। কেশব এ দৃশ্য দেখে ভাবে ও ভক্তিতে

অভিভূত। হৃদয় কানের কাছে ওঁ শব্দ বার বার উচ্চারণ করার পর ঠাকুর অর্ধচেতনায় ফিরে এলেন। তখন তাঁর মুখনিঃসৃত ব্রহ্মতত্ত্ব ও নানা সহজ সরল উপমাসহযোগে তার অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা কেশবকে আরও ভাবের ঘোরে টেনে নিয়ে একেবারে মাতাল করে ছেড়ে দিল। বললেন, 'ব্যাঙাচির যতক্ষণ লেজ থাকে ততক্ষণ সে থাকে জলে। লেজ খসে যাওয়ামাত্র এক লাফে ডাঙায় উঠে যায়। বাসনা, কামনা, লোভ, মোহের লেজ খসে গেলেই প্রাণে জাগে ঈশ্বরচিন্তা। তখন আকুল প্রাণে তাঁর জন্য কাঁদলে প্রাণের মাঝে তাঁর বাঁশি কেবল বেজে ওঠে—তাঁর প্রকৃত রূপ সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করে সর্বত্রই স্রষ্টা তার মাঝে বিরাজমান। তাঁর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করে। এখন তাঁকে পরম ব্রহ্মই বল, অথবা ব্রহ্মময়ী কালী বা কৃষ্ণই বল জগতে তিনি এক ও অভিন্ন।'

কৃষ্ণ কালী যা বলিস তুই
ভিন্ন নয় সে একজন বই।
সীমার মাঝে নানা সাজে
সে যে অসীম ব্রহ্মময়ী।
কত মণিমুক্তা রতনের হার,
ঝলসে কাল অঙ্গেতে মা'র।
মা যে বিশ্বজোড়া রূপের আধার,
তাই চাই না কিছু মাকে বই।
যখন প্রেমে ভেসে বাজায় বাঁশি
হয়ে ব্রজাঙ্গনা কেঁদে ভাসি
হৃদে উদয় হবেন কাল শশী
আশায় আশায় বসে রই।

এ আসর যখন ভাঙল আকাশে সূর্য তখন অস্তাচলে, আশ্রমের সান্ধ্য

প্রার্থনার সময় প্রায় সমাগত, এসব দেখে শুনে আশ্রমের ছেলে-বুড়োদের কেউ কেউ মজে গেল, অতি বুদ্ধিমান দু'একজন কিন্তু ভাবলে, 'এ সব তাকলাগান ভেলকি, না হয় পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়'। কিন্তু প্রকৃত ভক্তি, দিব্যদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার যাঁর কোন অভাব ছিল না এ পাগলকে ভাল করে তিনি চিনে ফেলেছেন। তারপরেই এই পাগলামি কেশবের মনকে নূতন আর এক আলোকে সমৃদ্ধ করে বার বার প্রেমের জোয়ারে দক্ষিণেশ্বর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কয়েকদিন পর ঠাকুর সম্বন্ধে বিশেষ এক প্রবন্ধ লিখলেন তাঁর নিজেরই সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায়; আর পরিচিত মহলে সবাইকে ডেকে ডেকে বললেন, দক্ষিণেশ্বর কালী-মন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে এক পরম যোগী ও স্বয়ং ঈশ্বর-প্রেরিত মহামানব। তখন থেকে ঠাকুরের দর্শন ও কৃপাপ্রার্থী হয়ে শুরু হল দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যহ ভক্ত সমাগম, প্রতি জেলার নামী অনামী বিভিন্ন স্তরের ও শ্রেণীর লোক। তাঁদের ভিতর বিশেষ বিশেষ যে সব নামের উল্লেখ পুথিপুস্তকে পাওয়া যায় তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁদের নামের উল্লিখিত তালিকা—বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, মহেন্দ্র কবিরাজ, রামচন্দ্র দত্ত, মদনমোহন দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বলরাম ঘোষ। এই সব ভক্তদের সকলের বাড়ীতেই ছিল তখন ঠাকুরের নিয়মিত আসাযাওয়া। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। ঠাকুরকে গান শোনাতে নরেন্দ্রনাথকে ডেকে আনা হয়েছিল। সংসারে উদাস ঈশ্বর-সন্ধানী নরেন গানের মধ্যে সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে উদাত্ত গলায় গাইলেন—'মন চল নিজ নিকেতনে'।

"মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
কেন ভ্রম অকারণে।

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেউ নয় আপন
পরপ্রেমে কেন হয়েছ চেতন
ভুলেছ আপন জনে।
সত্য পথে মন করহে ভ্রমণ
প্রেমের আলো জ্বাল করিয়ে যতন
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন
গোপনে অতি যতনে।
মন যদি দেখ পথে ভয়ের আগার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ
শমন কাঁপে যার শাসনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম
শ্রান্ত হলে সেথায় করিও বিশ্রাম
পথ ভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ
সে পান্থনিবাসী জনে।"

পরবর্তী কালে পৃথিবী হতে চিরবিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে বসে আপন মনে এ গান গেয়ে গেছেন বিবেকানন্দ। তখন তিনি কেবলমাত্র সিমলা দত্ত-পরিবারের নরেন্দ্রনাথ দত্ত নন, তখন তিনি আমেরিকার বিঘোষিত আধ্যাত্মিক মহাসমরে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর স্বামী বিবেকানন্দ। অযোধ্যানাথ পাকড়াশি রচিত ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত মহিমোজ্জ্বল ভাবব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ আর স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে পরিবেষিত এ গানের সুরতরঙ্গ বাঙালির হৃদয়তন্ত্রীতে চিরকাল বাজবে।

গান সাঙ্গ হল, কিন্তু যে যার আসনে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত উপবিষ্ট। ভাবে মন নেচে উঠে, ঠাকুরের দু'চোখ বেয়ে পড়ে জলের

ধারা। তবুও ভাব অতিকষ্টে সম্বরণ করে কয়েকবার নরেনকে ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার বেলায় নরেনকে কাছে ডেকে বলে গেলেন, 'দক্ষিণেশ্বরে আমার কাছে সময় করে একদিন অবশ্যই যাবি ; সেদিন আরও মন দিয়ে বসে বসে তোর এসব গান শুনব।' ভগবান আছে কি নাই—নরেনের বিদগ্ধ মনে দিনরাত তখন এ এক জ্বালাময় প্রশ্ন। সর্বদা এ ভাবনা তাকে নিয়মিত আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ভুলিয়ে দিতে বসেছে।

কলকাতায় সিমলার প্রসিদ্ধ দত্ত-পরিবারে নরেন্দ্রনাথের জন্ম। জন্মদিন ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। যখন নিতান্ত বালক তখন তিনি বাল্যের বিবিধ খেলার ভিতর দিয়েই প্রকাশ করেছেন তাঁর নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠা, কর্মতৎপরতা, খেলার ধ্যানে চিত্তের একাগ্রতা, সেবাপরায়ণতা, নিজের জীবন বিপন্ন করেও বিপন্নকে উদ্ধার করার সৎসাহসিকতা। এমন কি সমাজজীবনের যে অভিশপ্ত কলঙ্ক অস্পৃশ্যতা তার অসারতাকেও প্রতিপন্ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন বৈঠকখানায় সাজান হিন্দুদের নানা জাতির ও মুসলমান খ্রীস্টান মক্কেলদের হুঁকো একটির পর একটি ধরে প্রত্যেকটিতে মুখ দিয়ে। ভাবলেন মনে মনে, 'এতে জাত আমার গেল কোথায়? যেমন ছিলাম তেমনিই তো আছি।' অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলাচ্ছলে ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে সর্পের আগমন বার্তা টের পেলেন না, অথচ অন্যান্য ছেলেরা সাপ দেখে ভয়ে চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে গেল। ছাত্রজীবনে একাগ্রচিত্তে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলেন ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে। শেষে জেগে উঠল অস্থির ব্যাকুলতা। বিভিন্ন স্থানে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ঘুরলেন এই একটি মাত্র প্রশ্ন নিয়ে, 'ঈশ্বরীয় সত্তার কোথাও কি কিছু আছে, না জগৎটা শুধুই জড় অসার বস্তু। ঈশ্বর ইহজগতে যদি থেকে থাকেন, কেমন করে কিভাবে কিরূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যাবে? কিন্তু সন্ন্যাসীদের

তত্ত্বব্যাখ্যায় তাঁর জিজ্ঞাসুচিত্তের আলোড়ন প্রশমিত হল না। শুরু হল তারপর ব্রাহ্মমন্দিরে নিয়মিত আসাযাওয়া। দ্বারস্থ হলেন ধর্মাচার্য কেশব সেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের। দু'জনেই বললেন, 'যোগীর বহু সুলক্ষণ তোমাতে বিদ্যমান। একাগ্রচিত্তে ধ্যান কর—পরম ব্রহ্ম ঈশ্বরের উপলব্ধি নিশ্চয়ই তোমার হবে।' আশানুরূপ সদুত্তর তাদের মুখেও শোনা গেল না। আগুনের দাহ বুকে নিয়ে তীব্র অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে সর্বত্র ঘুরে সকাতরে ঈশ্বরকেই জানালেন শেষে অন্তরের কাতর প্রার্থনা, 'হে ঈশ্বর, সত্যসত্যই যদি তোমা হতে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে স্বরূপে আমাকে দেখা দিয়ে আমার মনের সন্দেহ ভঞ্জন কর। যে রূপটি তোমার প্রকৃত আমি তাই দেখতে চাই।'

এস নিজ রূপ ধরে, সাকারে তোমারে
এ চোখে দেখিতে চাই।
যদি থেকে থাক ভবে, পথ বলে দাও
সেই পথে চলে যাই।
করি তর্ক বিচারে শাস্ত্র প্রমাণ,
রাশি রাশি পুঁথি করি সন্ধান,
অন্ধমনের দ্বন্দ্ব ঘোচে না
কোন সাড়া নাহি পাই।
সৃষ্টির মাঝে হয়ত বিরাজ
বহুরূপী হয়ে নানাসাজে সাজ
চেয়ে চেয়ে দেখি, সকাতরে ডাকি
শেষে দেখি কিছু নাই।

'যত মত তত পথ'-এর দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ভাব ও প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে এখন আবদ্ধ। পার্থিব বিষয় ও উচ্চশিক্ষার অহেতুক দাম্ভিকতা কেশবের চরিত্রে কোন দিন

ছিল না। তিনি জাগতিক সব কিছু থেকে মনকে গুটিয়ে এনে একান্ত মনে উপাসনা ও সাধনার পথে সর্বদা ছিলেন ঈশ্বর অনুসন্ধানী। সাধনায় আয়ত্ত ঐশী তত্ত্বের আদানপ্রদানে পরস্পর দু'জনে দু'জনের পরমভক্ত হয়ে উঠলেন, তারপর হরিহরআত্মা। দেখাসাক্ষাৎ অনেকদিন না ঘটলে দু'জনের প্রাণই দু'জনের জন্য অসম্ভব ব্যাকুল হয়ে উঠত। ঠাকুর বসে বসে ভাবেন, 'কেশবের অন্তর আকাশের মত উন্মুক্ত উদার—বিশাল, তার ছায়াতলে নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে নিরাশ্রয় ধর্মপ্রাণ কত মানুষ। আমিও তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখে নিয়েছি।' আর কেশব ভাবতেন, 'অনন্ত ব্রহ্মোপলব্ধির অফুরন্ত তত্ত্ব নিয়ে বিশাল পৃথিবীর লোকচক্ষুর অন্তরালে দক্ষিণেশ্বরের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ এই পরমযোগী মহাপুরুষ। জগতের প্রকৃত ঈশ্বরভক্তদের এ অমৃতের স্বাদ পাওয়াতেই হবে। শেষে ভাবের মাত্রা ও আকর্ষণ আরও বেড়ে উঠে। হয় ঠাকুর ছুটে যেতেন কেশবের বাড়ী কমল কুটীরে, নয়ত কেশব ছুটে আসতেন দক্ষিণেশ্বরে। প্রাণের আবেগে ও প্রেমের আবেশে অশ্রুসিক্ত হওয়ায় শুরু হয়ে যেত দু'জনের কীর্তনে মাতামাতি, মাত্রাধিক্যে হাত ধরাধরি করে শেষে ভাবনৃত্য। অথবা অদ্বৈত ঈশ্বরসাধনায় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসমুদ্রে ডুবে থাকতেন দু'জনেই। এ ব্যাপার কেশবের বাড়ীতে ঘটলে সাধনার পর কেশবের মা ফলারে ঠাকুরকে পরিতৃপ্ত করতেন; তার মাঝে জিলাপির স্থান থাকত সর্বাগ্রে; তার দু'একখানা চেয়েচিন্তেও মাঝে মাঝে খেতেন। আর গরমকাল হলে কুলপি বরফ। একদিন বরিশালের স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ধুমধাম সহকারে কলকাতায় চলেছে তখন ব্রাহ্মদের মাঘোৎসব। ঠাকুর তাঁর ঘরে বসে অশ্বিনীকুমারকে নানা কথার পর বললেন, 'জান ক'দিন ধরে কেবল আমি কেশবের কথা ভাবি, আর তাঁর আসার আশায় কেবল গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকি'। ঠিক তৎক্ষণাৎ গঙ্গাবক্ষ থেকে ভেসে এল মৃদঙ্গের সঙ্গত সহযোগে কীর্তনের

সুরলহরী। দেখা গেল ছোট একখানা লঞ্চ ছুটে আসছে দক্ষিণেশ্বরের তীরের দিকে। গানের কথাগুলি ক্রমে স্পষ্টতর হল, 'সুরধুনী তীরে হরি বলে ফিরে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে'। 'ও আমার কেশব ছাড়া আর কেউ নয়'—বলে ঠাকুর আছাড় খেতে খেতে ঘাটের দিকে ছুটে গেলেন। ঠাকুরকে সামলাতে পিছনে ছুটলেন অশ্বিনীকুমার। তারপর ঘাটে লঞ্চ লাগা মাত্র এক লাফে উহাতে উঠে আনন্দে শিশুর মত কেশবকে জড়িয়ে ধরলেন। তীরে এসে কীর্তনের তালে তালে হাত ধরাধরি করে শুরু করলেন দু'জনে উত্তাল নৃত্য। গঙ্গাবক্ষের ঢেউয়ের নর্তন তখন প্রেমের আবেগে আরও উত্তাল। পরম ঈশ্বরভক্ত অশ্বিনীকুমার এ দৃশ্য দেখে পারলেন না আর চোখের জল সম্বরণ করতে। আবেগের অভিব্যক্তি জোর করে চেপে রাখলেন, কিন্তু অন্তরাত্মা চিৎকার করে এই বলে কেঁদে উঠল—'ওরে নিমাই আর নিতাইয়ের পরে বাংলার এই শ্যামল মাটিতে প্রেমে গলে আর কোন পাগল এমন করে নাচতে পেরেছে!'

এল গান গেয়ে নায় খেয়া দিয়ে
নিত্যানন্দ নদীয়ায়।
দেখে নেচে রঙ্গে প্রেমতরঙ্গে
ভরা গঙ্গা কূল ভাসায়।
নিতাই, কোথায় নিমাই নিমাই বলে
চলার পথে পড়েন ঢলে,
শেষে—পেয়ে নিমাইয়ের কোল প্রেমে গলে
চোখের জলে ভেসে যায়।
প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ
পিয়ে নাম-সুধা মকরন্দ
দু'জন নেচে নেচে প্রেমানন্দে
ঘরে ঘরে নাম বিলায়।

শেষে কেশব ও ঠাকুরের ভক্তগণের একসঙ্গে কীর্তনে মাতামাতি ও প্রসাদ বিতরণের পর অধিক রাত্রে ঠাকুরকে প্রণাম করে লঞ্চে কেশবের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারও কলকাতায় চলে এলেন।

ঠাকুর সম্বন্ধে কেশবের ক্রমাগত আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর সেদিনের বরেণ্য বঙ্গসন্তানগণ সকলেই ঠাকুরের পরিচিতি লাভ করেন। তখনকার প্রখ্যাত পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান মিরার' 'ধর্মতত্ত্ব', 'সুলভ সমাচার' ও 'পরিচারিকা'য় যাঁরা তারপর ঠাকুর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতেন সে সব লেখকদের নাম—প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি। এরপর ঠাকুরকে দেখতে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; মুগ্ধ হয়ে শুনলেন ঈশ্বরতত্ত্বের উপমা সহযোগে অপূর্ব ব্যাখ্যান, শেষে প্রাণকাঁদান গান শুনে শ্রবণ জুড়িয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

ঠাকুরের ধর্মীয় মতবাদের উদারতা সকল ধর্ম ও মতবাদের সাথেই হিন্দুধর্মের এক মহামিলনের সেতু গড়ে তুলল। তাতে বহু ব্রহ্মোপাসক কেশবের মত প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাদের ভিতর প্রধান একজন ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর সাধন-ভজন স্বতন্ত্র এক পদ্ধতি ও রূপ গ্রহণ করে জীবনের ধারাকে ভিন্ন খাতে বইয়ে নিয়ে গেল।

এদিকে নরেন্দ্রনাথ সর্বদা সর্বত্র ঈশ্বরসন্ধানে ঘুরলেন। কিছুতেই তাঁর অশান্ত মনের তৃষ্ণার আগুন নিবল না। অসহ্যবোধে শেষে মনে পড়ে গেল একদিন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কথা। মনে পড়ে গেল একবার মাত্র গিয়ে দেখা দিতে সেই শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের ব্যাকুল আহ্বানে। অন্তরে তখন তাঁর প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে, আর একদিনও অপেক্ষা না করে উন্মাদের মত ছুটে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের অত্যন্ত নিকটে এগিয়ে এসে আবেগভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়, আপনি নাকি ঈশ্বর দর্শন

করেন ; সে কোথায় বসে আর কেমন করে ?' 'হ্যাঁ করি, যেমন করে তোকে দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্ট করে।' আশ্চর্যবোধে নরেন প্রশ্ন করলেন, 'আমাকে দেখাতে পারেন ?' 'নিশ্চয়, যদি দেখতে চাস একদিন দেখিয়ে দেব ; তবে ও-চোখ দিয়ে নয়, তাকে দেখে চেনার মন ও চোখ দুই-ই সম্পূর্ণ আলাদা।'

তার পথের কথা নয় অজানা
যে পথে প্রেমের হাসি বেড়ায় ভাসি,
সেই পথে তার আনাগোনা।
পথ তার বিশ্বজোড়া,
তাতে বয় প্রেমের ধারা,
মোহেতে যে চোখ ভরা
সেই চোখে পথ দেয় না ধরা।
সোজা সে নয়ত বাঁকা
আছে তার অনেক শাখা
সাথে যার জ্ঞানের বাতি দিবারাতি
সে পায় পথের ঠিক ঠিকানা।
জগতে সকল কাজে
আছে সে সবার মাঝে
হৃদয়ে সদাই বসি
কান্নাহাসির বাজায় বাঁশি
সে একজনা।

'তোকে না বলেছিলাম এখানে এসে আমাকে একদিন গান শোনাবি, সেকথা ভুলে গিয়ে বসে আছিস, কেমন ? আসবি বলে তোর আসার আশায় অনেকদিন ধরে আমি বসে আছি। আমি বলছি ঈশ্বরদর্শন তোর হবেই।' ঠাকুরের এসব কথা শুনে নরেন্দ্রনাথের চেতনা যেন

হারিয়ে গেল। নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ ঠাকুরের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন নরেন্দ্রনাথ। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বিচার করলেন মনে মনে, 'কত লোকের কাছে গিয়েছি, এমন কথা জোর গলায় কখনও তো কাউকে বলতে শুনি নি, আমি ভগবানকে চোখে দেখেছি'। সেদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আর বেশী সময় না থেকে ঠাকুরকে প্রণাম করে, 'আমি শীঘ্রই আবার এখানে ফিরে এসে আপনাকে গান শোনাব', এই কথা বলে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের শেষ ও ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের সুরু—এই সময়ের ভিতরেই তরুণ কয়েকটি ছেলে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের সেবক ও ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।* তাঁদের নাম—রাখাল, নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, যোগীন ও মহেন্দ্র গুপ্ত। পরবর্তীকালে তাঁদের সন্ন্যাসজীবনের নাম—ব্রহ্মানন্দ (রাখাল), বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ), প্রেমানন্দ (বাবুরাম), নিরঞ্জনানন্দ (নিরঞ্জন), যোগানন্দ (যোগীন)। মহেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাই মাস্টার নামেই সর্বত্র পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি প্রত্যহের ভক্তসমাগমে ঠাকুরের মুখনিঃসৃত কথামৃত লিপিবদ্ধ করে অনন্তকালের জন্য এক সঞ্চয় রেখে গেছেন। তা তাপক্লিষ্ট ও দুঃখজর্জর মানুষের মনের ক্ষতজ্বালা অমৃতপ্রলেপ হয়ে চিরকাল জুড়িয়ে দেবে। ঠাকুর মাস্টারকে ডেকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তো বাপু বিদ্যাসাগরের পাড়ার লোক, তাছাড়া তাঁর ইস্কুলের মাস্টার। আমাকে তাঁর কাছে একদিন নিয়ে চল। আমার তাঁকে দেখতে বড় ইচ্ছা হয়।' এরপর মাস্টারের মুখে বিদ্যাসাগর এ কথা শুনে খুশি হয়ে দিন ঠিক করে ঠাকুরকে নিয়ে আসতে মাস্টারকে বলে দিলেন। সে দিনটি ছিল ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ৫ই আগস্ট। ঠাকুর যথাসময় ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে উপস্থিত,

সঙ্গে ছিলেন মাস্টার, ভবনাথ ও হাজরা। মাস্টার ঠাকুরকে উপরে নিয়ে যেতেই বিদ্যাসাগর ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের সসম্ভ্রম অভ্যর্থনায় বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন। ঠাকুর আসনে বসেই জল চাইলেন, তখনই জলখাবারও এসে গেল। বিদ্যাসাগর তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসেছিলেন। ঠাকুর খাওয়া সুরু করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আপন মনে ভাবছেন, 'ছেলেবেলা থেকে এই সাগরের নাম শুনে আসছি, আজ তা চোখে দেখলুম। সাগরে রত্ন থাকে, এ সাগরে আছে বিদ্যারূপ মহারত্ন। আর এঁর ধারা হচ্ছে জীবে প্রেম ও করুণা। অথচ তার সঙ্গে মিলে আছে নির্ভয় পৌরুষ। সমাজের কুসংস্কারের কুৎসিত আবর্জনা ঝেঁটিয়ে অনেক সাফ করে ফেলেছেন। লেখাপড়া শেখার জন্য দেশের ছেলেমেয়েদের পড়ার কত ভাল ভাল বই লিখে দিয়েছেন। মা জগদম্বে, দেশের ঘরে ঘরে বিদ্যাসাগরের মত তুই সাগর সৃষ্টি কর।' তারপর ঠাকুর ভাবের ঘোর অতি কষ্টে কাটিয়ে উঠে বলে ফেললেন, 'স্বচক্ষে আজ সাগর দেখলাম'। শুনে হেসে উঠে বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন 'লোনাজল কিছুটা তাহলে নিয়ে যান সঙ্গে করে'। 'না গো, লোনা জল তোমাতে কেন হবে, তুমি তো আর অবিদ্যার সাগর নও, বিদ্যার সাগর। তোমার তো সত্ত্বের রজঃ, সাত্ত্বিকতা থেকে তোমার এ নিষ্কাম সেবা ও কর্মপ্রবৃত্তি।' তারপর ব্রহ্মবিদ্যা-অবিদ্যার নানাবিধ আলোচনার পর রাত যখন ন'টা তখন সাগরের কাছে বিদায় নিয়ে সাগরকে নমস্কার করে সাগরদর্শনে তৃপ্ত ঠাকুর ভবনাথ ও হাজরাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন।

নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে অনবরত আসাযাওয়া বেশ কিছুদিন চলে, আবার শেষে বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বর প্রকৃত কি বস্তু চোখে দেখে ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে চিত্তের ব্যাকুলতায় প্রায়ই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত চলার পথে তখন দিগ্‌দিশাও হারিয়ে যায়। কয়েকটা দিন এভাবে কেটে গেলে ঠাকুরের প্রবল আকর্ষণ

আবার তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে টেনে নিয়ে আসে। তখন ঠাকুরের চরিত্র ও মনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁকে ঈশ্বরদর্শী নিষ্কাম সর্ববাসনামুক্ত যোগী বলে মেনে নিতে মনে আর কোন সংশয় থাকে না। নরেনের মুখের আবেগভরা গান শুনতে শুনতেও ঠাকুর মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হয়েছেন। বাহ্যচেতনা বিলুপ্ত হলেই ঠাকুরের মুখমণ্ডল হতে বিচ্ছুরিত হয় আনন্দময় দিব্যজ্যোতি। 'কই এ ভাব হতে আর কারও কোনদিন তো দেখি নি।' ঠাকুর চেতনায় ফিরে এলে ব্যাকুল হয়ে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, 'মহাশয়, আপনার উপদেশে মনকে তো সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তায় ডুবিয়ে রাখি ; কিন্তু কোথায় ঈশ্বর ?' 'সময় হলে ঠিক দেখতে পাবি। তুই তোর কাজ মন দিয়ে করে যা দুধ মজবে, দই হবে ; তবে তো ছানা উঠবে।' ঠাকুরের উপদেশ ও নির্দেশ মেনে আবার তাঁর অশান্ত মনের পথচলা সুরু হয়। এভাবে কিছুদিন চলার পর আবার নরেনের দেখা নেই। এবারের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত একদিন সহসা হল নরেনের পিতৃবিয়োগ। নরেনের পিতা শিমুলিয়ার বিশ্বনাথ দত্ত অতি অসময়ে ইহধাম ত্যাগ করলেন। তখনও নরেনের ছাত্রজীবন, সংসারে ছোট ছোট ভাই। পিতার সঞ্চিত একটি কপর্দকও ঘরে ছিল না। অথচ দু'টি পয়সা উপায় হবারও কোন দিকে কোন রাস্তা খোলা নেই। মা ও ছোট ভাইদের উপবাসক্লিষ্ট মুখের ছবি ফুটে উঠল কল্পনায় তাঁর চোখের সম্মুখে। ভাবলেন, 'এ সংসারে সকলের আগে নেবান চাই ক্ষুধার আগুন। তাতে ব্যর্থ হলে, আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা যার যত বড়ই থাক তাকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা সম্পূর্ণ বাতুলতা।' শেষে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে গিয়ে ছল ছল চোখে এ সব দুঃখের কাহিনী ঠাকুরকে নিবেদন করলেন।

ঠাকুর শুনে করুণায় গলে গিয়ে নরেনকে ভবতারিণীর মন্দিরের উন্মুক্ত দরজা দেখিয়ে দিলেন, 'যা ওখানে, মাকে বলগে তোর দুঃখের এ সব করুণ কাহিনী। মা করুণাময়ী—সে যে-ধন তোকে দেবে,

তাতে তোর আর কোন দুঃখ থাকবে না। যা, চলে যা, ঐ তো ওখানে মা; যা চাইবি মা তা'ই ঠিক তোকে দিয়ে দেবেন।' মন্ত্রমুগ্ধের মত নরেন্দ্রনাথ চলে গেলেন মন্দিরের দ্বারে। 'মা, আমার দুঃখ ঘুচাও, আমাকে অর্থ—না, না; সে যে ঘোর অনর্থ। বিকারের ঘোরে আমি ভুল বকেছি মা। আমাকে বিবেক দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও।'

গুরু, 'নিয়ে আয় ধন ভিক্ষা করে',
বলে পাঠালেন, মা তোরই দ্বারে।
মা তোর যে ছেলে রয় উপবাসী,
তার কেন হয় মন উদাসী,
তাই মা চোখের জলে ভাসি;
প্রাণের দুঃখ জানাই তোরে।
বিবেক-বৈরাগ্য পেলে,
বাঁধন খুলে সকল ফেলে,
আমি হব যোগী সর্বত্যাগী
ভুবাসনে আর মায়ার ঘোরে।

এরপর নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ফিরে এলেন, মুখের ভাব অতি বিমর্ষ। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, কি চাইলি মায়ের কাছে?' 'না টাকাকড়ি কিছুই চাইতে পারলাম না।' 'তবে কি চাইলি?' 'যা চাইলাম তাতে মা-ভাইদের আমার পেটের ক্ষুধা মিটবে না।' 'কি উপায় করবি তাহলে—যা আবার যা।'

এভাবে একবার দু'বার তিনবার গেলেন মন্দিরের দ্বারে। কিন্তু চাইতে গিয়ে টাকার বদলে চাইলেন,—'মা আমাকে বিবেক দাও, আমাকে বৈরাগ্য দাও, আমাকে ভক্তি দাও'। ঠাকুর তখন বললেন, 'মুখ ফুটে টাকা চাইতে যখন একেবারেই বোবা হয়ে গেলি তখন যা

চলে ঘরে; মায়ের ইচ্ছায় মোটা ভাত-কাপড়ের তোদের একটি দিনের জন্যও অভাব হবে না।'

সাময়িকভাবে একটি মাস্টারির চাকরি নরেন্দ্রনাথের জুটে গেল। দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতের হাত থেকে বেশ কিছুটা রেহাই পেলেন। আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠল না। তাছাড়া এপথে অধিক অগ্রসর হতে আরও বড় বাধা হয়ে উঠল তাঁর জাগ্রত বিবেক। ঠাকুরের কাছে যাওয়াও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। কোলাহলময় এ সব পরিবেশে ঈশ্বর লাভ হওয়া একেবারে অসম্ভব। এখন তাই মনের স্থির সঙ্কল্প হিমালয়ের নির্জনতায় চলে যাবেন।

পৃথিবীর শীর্ষস্থান এই হিমালয়। মহাকাশের মহা-ওঁকার যার মর্মে সুরসপ্তকে অনন্ত যুগ ধরে প্রতিধ্বনিত; যার দেহের প্রতিটি শিলাখণ্ড এদেশের মানুষ দেবতাজ্ঞানে প্রতিদিন পূজা করে; যার শিরের শুভ্র কিরীট বিধৌত করে নেমে এসেছে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী ও দিকে দিকে দেশমাতৃকার শ্যামল মাটিকে উর্বর করে বিছিয়ে দিয়েছে আপনাকে ধারার শতসহস্র শাখা-উপশাখায়। ঈশ্বরলাভের জন্য যোগীর যোগসাধনার প্রকৃতি-রচিত চিররম্য চিরসুন্দর পৃথিবীর পরম তীর্থপীঠ এই হিমালয়। তাই আর কোথাও নয়, ওখানে গিয়ে যোগাসনে ঈশ্বরধ্যানে বিভোর হয়ে থাকবেন তিনি।

নমো নমঃ হিমালয়,
ধ্যান-সমাহিত তপস্যারত
যোগীজন হে নিলয়।
অভ্র ভেদিয়া রুদ্র ললাট
শুভ্র তুষার ঘিরে,
জাগ্রত কাল দয়াল ভয়াল
উতলা সিন্ধুতীরে,

উদয় লগনে রঙীন উষার
ঝঙ্কারি ওঠে প্রাণে ওঁকার,
বাজে দিকে দিকে সুরসপ্তকে
বিশ্বভুবনময়।
স্তব্ধ অতল স্নিগ্ধ শীতল
নিজের অন্তরালে
নিজেরে রেখেছ ঢেকে গিরিরাজ
রহস্য মায়াজালে,
হৃদয়ে গঙ্গা-অমৃতসুধা,
পান করি তৃষা মিটায় বসুধা
প্রেমের দেবতা কঠিন পাষাণে
ধরণীর বিস্ময়।'

'তবে হ্যাঁ, ঠাকুরকে না বলে তাঁর অনুমতি না নিয়ে যাব না।' হঠাৎ কলকাতায় এক ভক্তের বাড়ীতে কয়েক দিনের মধ্যেই ঠাকুরের সঙ্গে নরেনের দেখা। ঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁর এ সঙ্কল্পের কথা ঠাকুরকে বললেন। ঠাকুর শুনে উত্তর দিলেন, 'চল আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ; যা আমার তোকে বলার সেখানে গিয়ে বলব। এসব কথা এখানে এখন থাক।' নরেনকে সঙ্গে নিয়েই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন। সেখানে পৌঁছনর পরে ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা না করে অতি নিভৃত নির্জন এক স্থানে নরেনকে ডেকে নিয়ে, অধীর চিত্তে তাঁর হাত দু'খানি ধরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান গেয়ে উঠলেন—

'কথা কইতেও ডরাই, না কইতেও ডরাই,
সদাই ভাবি তোরে হারাই হারাই'!

গানের সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত জলের মত নরেনের এই হাতের উপর ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু আর তার সাথে সাথে অনুতপ্ত অন্তরের

অথৈ অতলে তলিয়ে গেল নরেনের স্বয়ংকৃত সঙ্কল্প। অশ্রুর প্লাবনে গুরুর হাত ছ'খানি ভিজিয়ে দিয়ে কেঁদে উঠে ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলেন, 'যতদিন আপনি পৃথিবীতে থাকবেন, আর আপনাকে ছেড়ে কোথাও আমি যাব না'। ঠাকুর বললেন, 'না, তুই যাবি, তোকে যেতেই হবে। ঈশ্বরের এ বিধান কেউ রোধ করতে পারবে না।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'অনেক দূর থেকে না দেখলে আজকের ভারতের প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণ তোর চোখে ফুটে উঠবে না। তখন জরাজীর্ণ কুসংস্কারগুলি থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে খুলে দিবি অবজ্ঞাত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, আর্ত, ক্ষুধার্ত, পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত, মানুষের জ্ঞানের চোখ। তবে হ্যাঁ, আমি যতদিন বেঁচে থাকি আমার কাছে তুই থাক।'

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের সুরু থেকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের শেষ অবধি বহু নূতন নূতন ভক্ত সমাগমে ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ আকারে আরও বড় হয়ে গড়ে উঠল। নূতন এসব ভক্তদের নাম—কিশোর অধর, নিতাই, ছোট গোপাল, তারক, শরৎ, শশী, কালী, সারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, গঙ্গাধর, দ্বিজ, হরি, গিরিশ, ছোট নরেন, পলটু, নারায়ণ, সুবোধ, তেজচন্দ্র, হরিপদ, হরমোহন, হরিপ্রসন্ন, নিমাইচৈতন্য।

নিম্নোক্ত ভক্তদের সন্ন্যাসজীবনে নাম আবার পরিবর্তিত হয়েছে—সারদানন্দ (শরৎ), রামকৃষ্ণানন্দ (শশী), অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর), অভেদানন্দ (কালী), ত্রিগুণানন্দ (সারদা), তুরীয়ানন্দ (হরি), সুবোধানন্দ (সুবোধ), বিজ্ঞানানন্দ (হরিপ্রসন্ন)।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ছত্রছায়াতলে নিষ্কাম কর্মসাধনা ও সেবায় এঁদের সকলের প্রাণই উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ছিলেন তখন স্বনামধন্য অভিনেতা, নাট্যকার ও সুকবি। ঠাকুর কিছুদিন মাত্র পূর্বে নরেন্দ্র ও আরও কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে গিরিশের 'শ্রীচৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে দেখতে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যের অভিনয় দেখে।

পরদিন বলরাম ঘোষের বাড়ীতে গিরিশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; অত্যন্ত উৎসাহভরে গিরিশকে বললেন, 'বড় ভাল, বড় ভাল লেগেছে কালকের তোমার নাটক। আচ্ছা, চৈতন্যের অভিনয় যে-ছেলেটি করেছে, ও ছেলেটি কে গা! আহা, ওর প্রাণে কত ভাব ও ভক্তি! গিরিশ, ওকে ডেকে এনে আমাকে একবার দেখাও না।' উত্তরে গিরিশ বললেন, 'ও ছেলে নয়, একটি মেয়ে—নাম বিনোদিনী; আচ্ছা আমি ওর বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, এখনই ডেকে নিয়ে আসবে।' একটু পরেই বিনোদিনী এলেন। গিরিশের কাছে পরিচয় পেয়েই ঠাকুর 'মা' বলে বিনোদিনীকে ডেকে তাঁর মনের আড়ষ্টভাব সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিলেন; তাঁর প্রাণমাতান অভিনয় ও ভাবের উচ্চপ্রশংসা করে প্রাণ খুলে করলেন আশীর্বাদ। ঠাকুরের এইরূপ উচ্চপ্রশংসা ও আশীর্বাদে আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না বিনোদিনী; নুয়ে প্রণাম করতে ফোঁটা ফোঁটা জলে ঠাকুরের পা-দু'খানি ভিজে গেল। সংসারতরুর বৃন্তচ্যুত কর্দমাক্ত অথচ সুবাসিত একটি পদ্মকে ঠাকুর যেন তুলে নিয়ে অতি যত্নে ধুয়ে মুছে তার সব মলিনতা মুহূর্তে ঘুচিয়ে দিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করে উঠে মনে মনে ভাবলেন বিনোদিনী, 'ইনিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ; কত দিন কত লোকের মুখে ঠাকুরের নাম শুনেছি। অন্তরের এতখানি দরদ দিয়ে আমার দুঃখ বুঝে এত কথা কেউ তো কোনদিন আমার সঙ্গে বলে নি।' এরপর ঠাকুরের আশীর্বাদ মাথায় করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে এবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিনোদিনী; 'সংসারে আরও দশটা মেয়ের মত সুখে বাস করার ঠাঁই আর আমি পেলাম না। কর্মদোষে আজ আমি পতিতা। কলকাতার লোক আমার অভিনয় দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যারা আমাকে ঘিরে থাকে, নেশা ছুটে গেলে তাদের কাছেও আমি ঘৃণ্য অস্পৃশ্য। ঠাকুর অন্তর্দর্শী; কুৎসিত আবর্জনা ভেদ করে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয়ত আমার প্রাণে মাণিকের সন্ধান পেয়েছে। ঠাকুরের দেওয়া প্রলেপে মনের পুঞ্জীভূত গ্লানি মুহূর্তে যেন দূর হয়ে গেল।

এর কয়েকদিন মাত্র পরেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে নিজেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণির পাদপদ্মে নিবেদন করে এলেন।

অনুতাপের আগুন গিরিশের অন্তরেও একদিন দাবাগ্নির মত জ্বলে উঠেছিল, অতি অসহ্য বোধে পাগলের মত হয়ে শেষে ছুটে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন, 'ঠাকুর বলে দাও, কেমন করে আমি পাপের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হব ; কি করে আমার এ অভিশাপ ঘুচবে। যাতনায় দিনরাত জ্বলে পুড়ে আমি দগ্ধ হই ; পরিত্রাহি বলে চিৎকার করে পরিত্রাণের পথ কোথাও খুঁজে পাই না।' গিরিশের দিকে চেয়ে থেকে করুণায় ও ব্যথায় ঠাকুরের চোখ দু'টি জলে ভরে গেল। আগুনের স্পর্শে ভাবের ঘোরে গিরিশ তখন আবৃত্তি করে চলেছেন তাঁর স্বরচিত কবিতা --

'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি
কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই শেষে ভাবিগো তাই।
কে খেলায় ! আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর
হবে না কি ভোর,
অধীর, অধীর, যেমতি সমীর
অবিরাম গতি নিয়ত ধায়।'

'ঠাকুর আমি ঠিক বুঝেছি, আমার বুকের এ আগুন নেবাতে একমাত্র তুমিই পার। চিরদিন রঙ্গমঞ্চে যা নয় তাই সেজেছি আর মিথ্যা প্রলাপ বকেছি। শ্রোতা ও দর্শকদের প্রাণ তা দিয়ে একবার

হাসির তুফানে নাচিয়ে পরক্ষণেই আবার তাদের চোখে অশ্রুর প্লাবন বইয়ে দিয়েছি। অথচ নিজের মন নিজেকে প্রবঞ্চনা করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে আলেয়ার ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে। অপরাধের সেই ভারি বোঝায় জানি না কেন কিভাবে আগুন লেগে রাতদিন আমাকে দগ্ধ করে। এ আগুন তুমি নেবাও, তুমি আমাকে উদ্ধার কর, বাঁচাও।' বলতে বলতে চোখের জলে অঝোরে ভেসে গিয়ে গিরিশ বসে পড়লেন ঠাকুরের পায়ের তলায়। ঠাকুর বললেন তাঁর হাত ধরে, 'তবে চলে আয়, চলে আয় আমার সঙ্গে'।

'বল, কোথায় সে?'

'ওই ওখানে—ওখানে মা—জুড়াবার, দুঃখ ভুলবার, শান্তির পারাবার; তাঁর পায়ে আপনাকে তুই একেবারে বিকিয়ে দে।'

অবোধ মম রে—
তুই বিকিয়ে যা মার চরণতলে।
হোথায় সঁপে দিলে আপনারে তুই
ভবের জ্বালা যাবি ভুলে।
সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হলে
জল হয়ে যায় পাষাণ গলে,
মরুর কোলে তরু দোলে
ছড়ায় হাসি ফুলে ফুলে।
মা ঘুচিয়ে দেবেন মনের বিকার
তখন দেখবি ভবে কেউ নহে কার।
কেবল মা ছাড়া তোর নাই কেহ আর,
নিবেন হাত বাড়ায়ে কোলে তুলে।

ঠাকুর বললেন, 'তোর সব ভার আজ থেকে আমি নিলুম। সংসারে যেমনটি চলছিলি তেমনি চলগে যা—তবে সত্যকে বাদ দিয়ে নয়।

তা হলেই ঈশ্বরে মন বসবে, বদ অভ্যাস ঘুচে যাবে, শান্তি ফিরে পাবি।' এরপর ছায়া যেমন করে কায়াকে অনুসরণ করে ঠিক তেমনি করেই বাকী জীবন কায়মনোবাক্যে গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় উপদেশ অনুসরণ করে চলেছেন।

৫

ধর্মজগতে সকল ধর্মের সাধক ও সকল ভাবের ভাবুকদের সাথে অন্তরে অন্তরে মিশে গিয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার হাত থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন অনেকের মন। তখন নববিধান ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের পরিচালনায় প্রায়ই ধর্মসভার বিশেষ বিশেষ আয়োজন হত। হিন্দু, ব্রাহ্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও স্বেচ্ছায় তাতে যোগ দিতেন। একসঙ্গে সকলে মিলে হত ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রার্থনা-সঙ্গীত। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, গোঁড়া বৈষ্ণব কেউই বাদ যেতেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঈশ্বরতত্ত্বের অমৃতময় বাণী প্রেমের খরস্রোতে সকলের প্রাণ অমৃতত্বে ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

সর্বদা তাঁর অনুগামী পুত্রতুল্য ভক্তদের ডেকে ডেকে বলেছেন, 'ওরে তোরা শোন, তোদের সব দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন কেমন করে উঠত! এমন মোচড় দিত যে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তাম, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হত। লোকের সামনে, কি মনে করবে ভেবে, কাঁদতে পারতুম না। কোনও রকমে সামলে থাকতাম। আর যখন দিন গিয়ে রাত আসত, মার ঘরে, বিষ্ণু-ঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠত, তখন আর একটা দিন গেল—তোরা এখনও এলি না ভেবে আর সামলাতে পারতুম না; কুঠির ছাদে উঠে 'তোরা কে কোথায় আছিস আয় রে'—বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম ও ডাক ছেড়ে

কাঁদতুম। মনে হত পাগল হয়ে যাব। তারপর কিছুদিন পরে তোরা যখন সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি, তখন ঠাণ্ডা হই। আর আগে দেখেছিলাম বলে, তোরা যেমন যেমন আসতে লাগলি, অমনি চিনতে পারলাম।'

শুধু কি ভক্তেরা, তাঁর প্রাণের বাঁশির ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিদিন দু'বেলা দক্ষিণেশ্বরে ছুটে এসেছেন ধনী-নির্ধন, কাঙাল-দুঃখী, সকল ধর্মের সকল স্তরের লোক—তান্ত্রিক-বৈষ্ণব-পুরোহিত, পাদ্রি-মৌলবি, উকিল-ব্যারিস্টার-হাকিম, হেকিম-ডাক্তার-কবিরাজ, কবি-সাহিত্যিক —কেউ বাদ যান নি। বহুদিন পূর্বে মাইকেল মধুসূদন ও এর কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরের উদার ধর্মমত, ঈশ্বরভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

নিম্নে গঙ্গার বুকে প্রতিদিন চলচঞ্চল জলতরঙ্গের লীলায়িত খেলা। আর তার ঊর্ধ্বে তীরে প্রতিদিন দুই বেলা বসেছে লীলাময় ঠাকুরের প্রেমের মেলা। অসংখ্য ভক্তসমাগমে গঙ্গাতীর সর্বদা মুখরিত; সবাই ভক্তিবিগলিত চিত্তে পান করতে ছুটে এসেছেন ঠাকুরের হৃদয়মূল হতে উৎসারিত কথামৃত।

কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলছেন, 'ঈশ্বর যে সত্যই আছেন, কি করে তা বুঝব?' ঠাকুর শুনে হেসে উত্তর দিয়েছেন, 'সমুদ্রের জল লোনা, শুনেই লোকে বিশ্বাস করে; যে না করে, পান করে দেখে।'

'কিভাবে কেমন করে ঈশ্বরদর্শন হয়?'

'ঈশ্বরলাভের জন্য ধর্মজগতে যত মত আছে সবগুলিই পথ। তবে আমার মত, আমার পথই ভাল, অপরের নয়, এ ভাব ভাল নয়। একটি পুকুর, চারদিকেই তার ঘাট; চারঘাটে চারজন নেমে জল পান করলে; কেউ বললে জল, কেউ পানি, আবার কেউ বললে ওয়াটার, কেউ বললে একোয়া। ভিন্ন নাম কিন্তু একই বস্তু। একই ঈশ্বর, কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ বলে আল্লা, আবার কেউ বা বলে গড কেউবা জিহোবা।'

'আপনার মতে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?'

'যে ঈশ্বরকে চোখে দেখে দু'ভাবেই দেখতে পায়; তবে যারা সংসারী, তাদের পক্ষে সাকার উপাসনাই সহজ পথ। এক মায়ের তিন চার ছেলে। সকলকেই মা সমান ভালবাসেন; কিন্তু পেটের অবস্থা বুঝে সব ছেলের জন্য খাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা। কারোর জন্য কালিয়া পোলাও, আবার কারোর জন্য ভাত মাছের ঝোল। ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্, জ্যোতির তিনি অনন্ত সমুদ্র। দেবর্ষি নারদ দূর থেকে একটুখানি দেখেই ফিরে এসেছেন। শুকদেব একটুখানি স্পর্শ করেছিলেন মাত্র। আর শিব—তিন গণ্ডূষ মাত্র পান করে শব হয়ে পড়ে রইলেন। কি রকম জান—এ যেন পিঁপড়ের কাছে চিনির পাহাড়—এক দানা খেয়ে, আর একদানা মুখে করে নিয়ে এল।'

এই রূপ প্রতিদিন হাজার হাজার কথা ও অমৃতময় উপদেশ ভক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত লিপিবদ্ধ করে—অমৃতের পূর্ণ ভাণ্ড পৃথিবীর মানুষের জন্য সঞ্চয় করে রেখে গেছেন। ভক্তেরা প্রতিনিয়ত আকণ্ঠ পান করেছেন ঠাকুরের কাছে থেকে।

ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে তার স্থূল, সূক্ষ্ম বস্তুতে প্রেম ও সত্যরূপে প্রতিনিয়ত প্রদীপ্ত। যার প্রাণ আছে কান পেতে প্রতিনিয়ত তাঁর গান শোনে—'সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর'। যার চোখ আছে সে দেখে, ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ মহাশক্তি—সক্রিয় তাঁর মহাতেজে জগৎ সৃষ্টি করে, তার মধ্যে সর্বত্র প্রেমের রূপে, সুন্দরের রূপে, প্রতিটি গ্রহে উপগ্রহে, স্থলে, সমুদ্রে, পাহাড়ে সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান। জগতের সৌন্দর্যময় ঐশ্বর্যের সব কিছুতেই তিনি। যে পথে নদী বয়, যে বনে ফুল ফোটে, যেখানে শার্দুল ও সিংহ হিংসা ভুলে গিয়ে তাদের শাবকদের নিয়ে পরমানন্দে খেলা করে, এর সব কিছুর মধ্যেই ঐশী তত্ত্ব ও সত্তার পূর্ণ বিকাশ। আবার ভোগবাসনা-ত্যাগী মানুষের নিষ্কাম সেবার মধ্যে তাঁরই আর একটি রূপ। প্রলয় ও ধ্বংসের শেষে নূতন সৃষ্টির উন্মেষে আবার তাঁরই আত্মপ্রকাশ।

দুস্তর এ পারাবার অতিক্রম করতে এসে আর তার খেই না পেয়ে ভাবোন্মত্ত কত ভক্ত হয়েছে পাগলা-ক্ষ্যাপা-বাউল।

অকূল ভবনদী, কোথায় তোর ও-কূল,
শুধুই যায় রে দেখা ধু-ধু বাঁকা
গোলোকধাঁধার সমতুল।
সেথায় সূর্য বসেন যখন অস্তাচলের পাটে,
পাগল মন কেন মোর বাজায় বাঁশি
ভাঙ্গা-গড়ার হাটে।
কেন বাঁকা হাসে আধখানা চাঁদ
মাথায় রেখে তারার ফুল।
তোর ঐ কূলেতে দিতে পাড়ি,
ঝড়তুফানের মুখে পড়ি
ঘুরপাকেতে কেবল ঘুরি
আমি জীর্ণ তরী ছিন্নমূল।
ও নদী রে—
আমি জনম জনম বাইলাম তরী
তবু ভাঙল না কালপথের ভুল।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী কিছুদিন রোগভোগের পর কেশবচন্দ্র লোকান্তরিত হলেন। এ দুঃসংবাদ কানে শোনামাত্র বাণবিদ্ধ পাখীর ন্যায় অসহ্য ব্যথায় ঠাকুর ধরাশায়ী হয়ে পড়ে রইলেন। কেশবের সাথে মিলনের পর ক্রমাগত প্রায় ন'বছরের কতদিনের কত কথা মনে আসায় বালকের ন্যায় সারাদিন চোখের জলে বুক ভেসে গেল। —'হায় হায়, আমার আগে আমাকে ফেলে কেশব পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল! কেশবের অন্তর ছিল অনন্ত আকাশের মত উদার, রত্নের অনন্ত ভাণ্ডার, সে কথা আমি জানি। বিরাট তার ছত্রছায়াতলে,

জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝায় কত নিরাশ্রয় আশ্রয় পেয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞ এই মহাসাধকের মহাপ্রয়াণের কিছুদিনমাত্র পূর্বে কমলকুটীরে ঠাকুর তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। কেশবের শয্যা ত্যাগ করা বারণ। তবুও ঠাকুরের কথা শুনে আর শুয়ে থাকতে পারলেন না। অতি কষ্টে উঠে ঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'বাগানের মালী তার গাছে আরও ভাল ফুল ফুটাতে চেয়ে তার শিকড়ের শক্ত মাটি খুঁড়ে ধুলোট করে দেন। ও মাটি পরে আবার শক্ত হয়ে যায়।' কেশবের বসতে বড় কষ্ট হচ্ছে দেখে ঠাকুর আবার বললেন, 'এবারে শোও গিয়ে যাও।' নত হয়ে ঠাকুরকে নমস্কার করে অতি কষ্টে উঠে ধীরে ধীরে কেশব ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরে ঠাকুর কেশবের মাতা সারদাদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অতি বিমর্ষ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন।

কলুটোলার ধনসমৃদ্ধ অথচ আচারনিষ্ঠ এক বৈষ্ণব পরিবারে কেশবচন্দ্রের জন্ম। তাঁর পিতামহ রামকমল সেন ছিলেন সে সময়ের বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান আর পিতা প্যারীমোহন সেন দেওয়ান ছিলেন টাকশালের। সুতরাং আজন্ম ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কোলে কেশব প্রতিপালিত। তবুও তাঁর মন অত্যাশ্চর্যভাবে ধনৈশ্বর্যের পাশ কাটিয়ে পরমৈশ্বর্যময় ঈশ্বরতত্ত্বের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল। ঈশ্বরকে স্মরণ করে একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করলেন প্রাত্যহিক প্রার্থনায়। এই প্রার্থনাই অন্তরে অন্তর্যামী হয়ে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে প্রতিদিন আজীবন তাঁকে সম্মুখের চলার পথ দেখিয়েছে। তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র। ছাত্রজীবনেই পরম নিষ্ঠায় পড়াশুনা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে অতি সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পবিত্র সান্নিধ্যলাভের পূর্বেই কলুটোলায় তাঁর পৈতৃক বাড়ীতে এক নৈশ বিদ্যালয় ও প্রার্থনাসভার প্রতিষ্ঠা করলেন। একাজে তাঁর সমবয়সী ও সমপাঠী প্রতাপ মজুমদার ছিলেন অতি উৎসাহী সহযোগী।

রাজা রামমোহনের প্রোথিত উপনিষদ-বেদান্ত-সম্মত একমেবা-দ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরতত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে, লালিত হয়ে উঠল দেবেন্দ্রনাথের অপরিসীম সেবাযত্নে। এরপর কেশবচন্দ্রের সেবাযত্ন ও চেষ্টায় চারদিকে বিস্তৃত হল তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। দেশে গড়ে উঠল বহু ব্রাহ্মমন্দির। সাত বছর আদি ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে থেকে পরে স্বয়ং নববিধান নামে প্রগতিশীল আর একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তার মাধ্যমে ধর্মপ্রচার, দেশ ও সমাজসেবার কাজে ব্রতী হলেন। সার্কুলার রোডে কমল-কুটীর ছিল তাঁর স্বনির্মিত বাসভবন এবং এই সঙ্গে ধর্ম ও কর্মশালা। 'ইণ্ডিয়ান মিরার', 'ধর্মতত্ত্ব', 'সুলভ সমাচার', 'নববিধান', প্রভৃতি পত্রিকা ও বক্তৃতার মাধ্যমে পৃথিবীর দেশবিদেশে প্রচার করলেন তাঁর সাধনলব্ধ ধর্মবিজ্ঞান। এক কথায় ওখন সম্পাদক কেশবচন্দ্র, লেখক কেশবচন্দ্র ও বাগ্মী কেশবচন্দ্র বাংলার বিদগ্ধ সমাজের ছিলেন মুকুটমণি। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সঙ্গলাভের পর সাধনার পথে ব্রহ্মময়ী কালী ব্রহ্ম হতে সম্পূর্ণ অভিন্নরূপে তাঁর প্রাণে এসে ধরা দিল। যেখানেই যখন যেতেন ফিরে এলে রামকৃষ্ণকে দেখা না দিয়ে দূরে থাকা আর কোনপ্রকারেই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। শেষে তাঁর অকাল তিরোধানে মর্ত্তলোকে দু'জনের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ও ব্যবধান রচিত হল। তারপর ইহধামে ঠাকুর যতদিন ছিলেন কোথাও কোন প্রকারে কেশবের প্রসঙ্গ উঠলে আর চোখের জল তাঁর পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব হত না।

বন্ধু আজও বসে থাকি গঙ্গার এই কূলে
জানি তরণী তোমার ভিড়িবে না আর
প্রাণে তার ঢেউ তুলে।
তব সুখনীড় নিবিড় ছায়ায়
প্রেমরসে ভাসি বসি দু'জনায়,

এক হয়ে গেছি মিলি সাধনায়
কালী-কল্পতরুমূলে।
আজ সাথীহারা একা
তুমি নাই আর,
বুকভরা স্মৃতি বেদনার ভার
যবে ভব-পারাবার হয়ে যাব পার
তখন থেক না ভুলে।

কেশবের প্রয়াণের প্রায় দু'বছর পরে ঠাকুর যখন রোগশয্যায় তখন শয্যাপার্শ্বে একদিন কেশবের মা সারদা দেবীর সঙ্গে কেশবের ছেলেদের দেখে দুঃখে বালকের মত কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। আদর করে ছেলেদের কাছে ডেকে স্নেহভরে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। অনেক রাত বসে দুঃখের অনেক কথা হল। শেষে দুঃখভরে অত্যন্ত অবসন্ন মন নিয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে অনেক রাত্রে বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন সারদা দেবী।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস। এ সময় ঠাকুর গলরোগে বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হন। গলায় ঘা, তাই খেতে অসম্ভব কষ্ট হয়। ডাক্তার এসে ভাল করে দেখে ওষুধের ব্যবস্থা করে গেছেন। বেশি কথা বলা একেবারে বারণ। কিন্তু ঠাকুর অনর্গল কথা বলেন। কেউ বারণ করলে উত্তরে বলেন, 'লোকগুলি দুঃখকষ্ট ভুলতে, কত দূর দূর শহর ও গ্রাম থেকে এখানে আসে। দু'টো মুখের কথা শুনবে বই তো আর কিছু নয়। তা দেহটার একটুখানি আরামের জন্য কেমন করে এদের বলি, "তোরা আসিস না"।' অথচ দিনের পর দিন লোকসমাগম বেড়েই চলছে। ওষুধে রোগের উপশম একটুও হয় না দেখে সারদামণি ও ভক্তেরা বিশেষ চিন্তিত। অথচ কোথাও কোন ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বা কীর্তনের কথা শুনলে এখনও ঠাকুরকে ধরে রাখা দায়। দিনের পর দিন ক্রমেই শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ। নির্জনে ভাল চিকিৎসার জন্য

৫৫নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটে দোতলা একটি বাড়ী ভাড়া করে ঠাকুরকে সেখানে নিয়ে আসা হল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও তাঁর সঙ্গে আরও দু'একজন নামী ডাক্তার ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দুরারোগ্য কর্কট বলে এ রোগকে সন্দেহ করলেন। শুনে ভক্তদের মাথায় সহসা যেন আকাশের বাজ ভেঙ্গে পড়ল। ঠাকুরের নিশ্চিত তিরোধানের আশঙ্কায় ভক্তেরা সবাই অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠলেন। সারদামণিও ঠাকুরের শুশ্রূষার জন্য দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে উঠে এলেন শ্যামপুকুরের বাড়ীতে। সর্বদা সেবাযত্ন ও ঔষধে রোগের বিন্দুমাত্রও উপশম হল না দেখে ভক্তেরা কাশীপুরের উন্মুক্ত এক বাগানবাড়ী ভাড়া করে সেখানে ঠাকুরকে নিয়ে এলেন। যাতে লোকের ভিড় না জমে ওঠে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হল। লোকসমাগমের তবুও বিরাম নাই। ভক্তেরা সকলেই ঠাকুরের সেবায় তৎপর। কিন্তু ঠাকুরের সেবার কাজে দিনরাত্রির জন্য সম্পূর্ণ আপনাকে উৎসর্গ করেছেন লাটু মহারাজ। তাঁর সেবা দেখে মুগ্ধ হয়ে সবাইকে ডেকে একদিন বলেছেন নরেন্দ্রনাথ, 'কি করে সেবা করতে হয়, লাটুর সেবা দেখে সবাই শেখ'। লাটু ছিলেন অবাঙালি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি অপত্যস্নেহে লাটুকে পালন করেছেন। অতি উৎসাহে ঠাকুর নিজে তাঁকে কিছু কিছু বাংলা লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন। লাটুর সন্ন্যাস জীবনের নাম ছিল অদ্ভুতানন্দ। নারীভক্তদের মধ্যে ছিলেন বিনোদিনী, অঘোরমণি। বিনোদিনীর পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অঘোরমণি গোপালের মা বলে ভক্তসমাজে ছিলেন পরিচিত। কিন্তু কপাল-দোষে গোপালকে অকালে হারিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর খুঁজে পেলেন একদিন তাঁর হারানো গোপালের সন্ধান। ঠাকুরকে মিষ্টি নাড়ু আর মোয়া খাইয়ে কত আনন্দই না তাঁর প্রাণে হত। আবার ঠাকুর চেয়েচিন্তেও তাঁর কাছ থেকে খেতেন। তখন ঠাকুরকে 'আবদেরে ছেলে' বলে গোপালের মা হেসে উঠতেন।

কাশীপুর বাগানবাড়ীতে সারদামণি ও ভক্তদের সর্বদা সেবাযত্নে

ঠাকুরের স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি দেখে আবার ভক্তদের সকলের ম্লান মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। সেদিন ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। বাগানে একটুখানি বেড়াবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর নীচে নেমে এসেছেন। ফটকের কাছে ঠাকুরকে দেখেই গিরিশের সহসা ভাবান্তর। উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরের স্তবপাঠ শুরু করলেন। আর দণ্ডায়মান অবস্থায় রোমাঞ্চিত হয়ে ঠাকুর হলেন সমাধিস্থ। ভক্তগণ এ দৃশ্য দেখে যে যেখানে ছিলেন ছুটে এসে গ্রহণ করলেন ঠাকুরের পদধূলি। কেউ বা তাড়াতাড়ি ফুল বেলপাতা সংগ্রহ করে 'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' বলে ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ করলেন। ভক্তদের চোখে অভিনব লীলাময় এ এক অপূর্ব দৃশ্য!

'খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময়॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার।
ধে ধে ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার॥'
—স্বামী বিবেকানন্দ

একটু পরে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হল। তখন একে একে সকলকে কাছে ডেকে বুকে হাত দিয়ে এই বলে জাগ্রত করলেন নূতন ঐশীচেতনা, 'তোমাদের সকলের চৈতন্য হক। তোমাদের দ্বারা জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হক।'

এর কিছুদিন পরে গঙ্গাসাগরের মেলা। সেইজন্য কলকাতায় দেশবিদেশের অনেক সাধুর সমাগম। ভক্ত গোপালের ইচ্ছা সাধুদের

তিনি গৈরিক বস্ত্র দান করেন। এ ইচ্ছার কথা ঠাকুরকে বলতে ঠাকুর বললেন, 'ভাল কথা, কিন্তু এখানে আমার কাছে ছেলেরা যারা আছে তাদের চেয়ে ভাল সাধু তুমি কোথায় পাবে।'

'তবে তাই করুন, এদেরই দিয়ে দিন।'

গোপাল বারখানি গৈরিক বসন ও সমসংখ্যক রুদ্রাক্ষের মালা বিতরণের জন্য ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করলেন। নিম্নলিখিত ভক্তদের একে একে ডেকে এনে ঠাকুর তাঁদের দান করলেন রুদ্রাক্ষের মালাসহ একখানি করে গৈরিক বসন। যথাক্রমে সে সব ভক্তদের নাম—নরেন, রাখাল, যোগীন, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, বুড়ো গোপাল, কালী ও লাটু। বাকীমাত্র একখানি ছিল। সেখানি ঠাকুর পরে গিরিশকে দিয়েছিলেন।

অতি নির্জনে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলার পবিত্র মাটিতে সেদিন নিষ্কাম ত্যাগী সন্ন্যাসীসঙ্ঘের অমোঘ মহাশক্তির উদ্বোধন হল। শিষ্যদের সবরকম হিতোপদেশ দেওয়ার পর গুরুপ্রদত্ত শিক্ষা হল কামিনীকাঞ্চন, বিষয়বাসনা ত্যাগ, এমনকি মুক্তির বাসনাও ত্যাগ করে জগতের হিতে অবিরাম নিষ্কাম কর্মসাধনায় ব্রতী থাকা। ভবিষ্যতে পৃথিবীময় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনরূপ বিরাট মহীরুহের বীজ অতি ক্ষুদ্রায়তন ঐ বাগানের মাটিতে সেদিন প্রোথিত হল।

এর মাত্র কয়েকটি দিন পরেই কাশীপুর উদ্যানে ঈশ্বরের ধ্যানে বসে নরেনের হল চিরআকাঙ্ক্ষিত নির্বিকল্প সমাধিলাভ। দেহ নিস্পন্দ অসাড়, মন ঊর্ধ্বে উঠে প্রত্যক্ষ করল অনন্ত ব্রহ্মময় আনন্দলোকে ষোলকলায় পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় পূর্ণাবয়বে প্রেমালোকে ফুটে উঠেছে মহাযোগী ব্রহ্মবিজ্ঞানী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখচন্দ্রমা। ধ্যানলব্ধ তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ অখণ্ড জ্যোতির তেজপুঞ্জ সে চন্দ্রমা হতে প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরিত। তার ঝরণার পবিত্র ধারায় ধারায় পৃথিবীময় প্রেম ও ভাবের এক মহাপ্লাবন। এই যুগাবতার মহাপুরুষ, অজ্ঞানপ্রসূত ভুলভ্রান্তি হিংসার অবসান ঘটাতে চেয়ে সত্য শিব সুন্দরের রূপে পরমব্রহ্মময়ীর

কোলে মহাধ্যানে যোগাসনে সমাহিত। সমাধির এ অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ ভাল করে চিনলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কে!

ওঁ

'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'

দেখা দিলে দীন পূজারীর বেশে
ভবমন্দিরে এসে।
নিঃশেষে প্রাণ সবারে বিলায়ে
মিলাইলে অবশেষে।
তিলে তিলে স্থূল দেহ করি লয়
লভেছিল জ্ঞান অমৃত অব্যয়
সকল হৃদয় করে গেলে জয়
সমভাবে ভালবেসে।
তব জ্ঞান দ্যুতি অনন্ত অক্ষয়,
নিবিড় কালিমা যার দেহাশ্রয়,
যোগ জ্যোতির্ময় নক্ষত্রনিলয়
উজলি উঠিল হেসে।
যেথা দেখিনু তোমারে পরম বিস্ময়
ব্রহ্মময়ী কোলে তুমি ব্রহ্মময়—
কাম, ক্রোধ, পাপ, তাপ করি লয়
সমাহিত যোগিবেশে।

বুড়ো গোপাল নরেনকে এ অবস্থায় দেখে ত্রস্ত ও ভীত হয়ে ঠাকুরকে গিয়ে এই বলে খবর দিলেন, 'ধ্যানে বসে নরেনের হাত পা কেন যেন শক্ত হয়ে গেল! আপনি একবার নীচে নেমে আসুন; আর বোধ হয় নরেন বাঁচবে না!' শুনে ঠাকুর বললেন, 'চুপ করে থাক্;

একটু পরে আপনি ঠিক হয়ে যাবে।' সমাধি যখন ভঙ্গ হল তখন অসাড় দেহে হাত দিয়ে নরেন নিজেই বুঝতে পারছেন না এ দেহ তাঁর নিজের কিনা। সম্পূর্ণ শেষে আত্মস্থ হয়ে ঠাকুরের ঘরে ছুটে গেলেন। নরেনকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'কিরে, এতদিনের সাধ এবারে মিটল তো?'

'হ্যাঁ, তবে আরও একটু দয়া আপনি আমাকে করুন। আমি যেন মহর্ষি শুকদেবের ন্যায় সচ্চিদানন্দসাগরে এভাবে আজীবন ডুবে থাকতে পারি।' 'না গো না, কিছুতেই ওটি হতে দেব না। ভাঁড়ার ঘর তোরই বটে কিন্তু চাবি থাকবে আমার হাতে, দরকার হলে খুলে দেব।' ঠাকুর আবার বললেন, 'নিজের মুক্তি ও আনন্দের কথা এখন ভুলে যা; তুই তোর কথা নিজে জানিস না, কিন্তু আমি জানি। তুই সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক মহর্ষি। মানুষের মঙ্গলসাধনের জন্য পৃথিবীতে জন্মেছিস। তুই তো মুক্ত পুরুষ, তোর আবার মুক্তির ভাবনা কিরে? চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখ, যুগ যুগ সঞ্চিত পাপ ও আবর্জনার বোঝা পর্বতপ্রমাণ উঁচু হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। এতে জোরে নাড়া দেওয়ার মত এত বড় শক্তি তোর ছাড়া আর কারও নেই। এসব কথাগুলি আমাকে বলে দিতে হবে না। সময়মত নিজেই সব ভাল করে বুঝবি।' এসব শুনে নরেন ঠাকুরকে প্রণাম করে মৌন হয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু মন বলল, 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'।

পরবর্তীকালে ১৮৯৩ সালে গুরুনির্দিষ্ট পথে বেদান্তধর্ম ও সমন্বয়বাদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে শিকাগো ধর্মমহাসভায় ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশগুলিতে যখন তাঁর জয়জয়কার তখন শতচ্ছিন্নবাস ক্ষুধার্ত জীর্ণশীর্ণ শৃঙ্খলিত কর্মহীন চেতনাহীন অবহেলিত উৎপীড়িত কঙ্কালসার কোটী কোটী ভারতসন্তানের মুখ ভেসে উঠল তাঁর চোখের সম্মুখে। পদে পদে বিবাদবিভেদে ব্যবধানের প্রাচীর তুলে পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ পৃথিবীর আদি সুসভ্য এক মহাজাতির

বিষময় এই পরিণাম। অথচ সভ্যতার আদিতে এই জাতিই সর্বাগ্রে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঈশ্বরকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়মাধীনে চেতনা ও বুদ্ধিবলে অতি সহজেই অন্যান্য প্রাণীজগৎ অতিক্রম করে একত্র ও সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষ ভূমণ্ডলের দিকে দিকে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার জ্ঞানসভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সত্য ও তত্ত্বানুসন্ধানী মনের মাঝে জাগল একদিন এইরূপ জিজ্ঞাসা—'কে সৃষ্টি করেছে সৌন্দর্য্যময় এই বিশাল জগৎ! এলেম আমি কোথা থেকে?'—এই প্রশ্নের উত্তরেই অনুসন্ধানী মনের মাঝে অনুভূতির পথে ঐশী সত্তার সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ। আরও পরবর্তী-কালে ভারতীয় ঋষিদের যোগ, তপস্যা, ধ্যান ও বিজ্ঞানসাধনায় তাঁর অনন্ত শক্তি ও বিভূতির দর্শনলাভ ও মানবাত্মার সাথে যোগাযোগ। তাঁদের কঠোর তপস্যায় তখন ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্তা চতুর্বেদ রূপে ধ্বনি ও সঙ্গীতে জগতে মূর্ত হয়ে উঠল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ হতে উদ্গীত হল ভগবদ্‌গীতা, রচিত হল উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত। সেই পরম পিতার আজ্ঞাবহ দূত ও পুত্র হয়ে মানুষই যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে আবার স্বয়ং অবতারে অনন্ত মহাশক্তিরূপে মনুষ্যদেহেই তাঁর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। মানুষ মহাশক্তির আধার; মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় খুলে দিয়েছে অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির রুদ্ধ দ্বার। অতএব তাঁর অনন্ত সৃষ্টিতে মানুষ তাঁর বহুরূপেরই একটি সর্বপ্রধান রূপ। এই মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেও যারা অন্ধ আতুর অস্পৃশ্য নিপীড়িত নিজ দেশে গিয়ে তাদের সেবা করাই হবে তাঁর ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। তাঁর সমাজ ও সংসারের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে আজ তারা ছড়িয়ে আছে নররূপে, তারা নারায়ণ। ঈশ্বরের পরিপূর্ণ রূপ তখন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অন্তরে বিকশিত হল। আর এভাবে পূর্ণাবয়বে ঈশ্বরকে দর্শন করাতে ঐ ক্ষীণকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কত বড় দিশারী এ কথা ভাল করে বুঝে জগৎকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।

দেশে ফিরে এসে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির স্থাপন করলেন। স্থাপিত হল রামকৃষ্ণমিশন ও মঠ। অন্তরের প্রদীপ্ত মনীষায় জগৎ জয় করে নিজ দেশে পরাধীনতা, দীনতা হীনতার অভিশাপে জর্জর নিরন্ন নরনারায়ণদের সেবায় মিশনের সন্ন্যাসীদের সাহচর্যে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। আসমুদ্রহিমাচল ঘুরে সর্বত্র প্রচার করলেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

কিন্তু একদা এই মহাজাতি

'তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।'

এত ঊর্ধ্বে ছিল যার স্থিতি, এত অধোগতি পরে তার কেমন করে সম্ভব হল? এত বড় অবনতি, যার সর্বশেষ পরিণতিতে দেশ শতধা ছিন্নভিন্ন হয়ে বিদেশীর পদানত, হাতপা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, ধর্ম হল দেবীর দুয়ারে নরবলি, গঙ্গার জলে শিশু বিসর্জন, আর সামাজিক বিধান হল মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত স্ত্রীকে হাতপা বেঁধে পোড়ান—যার নাম সতীদাহ। এর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে হাজার হাজার বছরের পুরাণ ও ইতিহাসের বহু তথ্য সংগ্রহ করে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ ও পুস্তকের মাধ্যমে তা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলেন। সে সব রচনাবলী পর্বে পর্বে অগ্নিগর্ভ আর এক নূতন মহাভারত, অভীমন্ত্রে দেশকে দীক্ষিত করে দিলেন সম্মুখে চলার প্রকৃত পথনির্দেশ। তার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া গেল।

'হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার

সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভাবতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বাবাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত—'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

তাঁর এই মহাশঙ্খের' অভয় নিনাদে সারা ভারত তখন চেতনায় আবার উদ্বুদ্ধ হল। ১৯০২ সালেব ৪ঠা জুলাই মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষ হলেন লোকান্তরিত। মাত্র তার দু'এক বছর পরেই স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহায় বাঙলার তরুণসমাজে শিকলভাঙ্গার প্রয়াস ঘোর বিপ্লবের পথে আত্ম প্রকাশ কবে—যাব নাম "অগ্নিযুগ"।

সেদিন হয়েছে মুক্তির তরে মাতৃমন্ত্র লিখা।
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকের বাণী
সুরেন, বিপিন, কত জ্ঞানীগুণী
প্রাণের আকাশে রবির প্রকাশ, দূর করি কুহেলিকা॥
বাঙালী সেদিন শক্তিমন্ত্রে রক্ত কমল করে
বাঙালি সেদিন ভায়েরে বেঁধেছে বাহুবন্ধন ডোরে,
বনের আড়ালে, পাহাড়ে নগরে
আহুতি হয়েছে মুক্তিসমরে
চিতার ভস্মে জাতির ললাটে পরাল জয়ের টীকা॥
শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্র আর

রুদ্র বীণায় তোলে ঝঙ্কার
মরণের ডাকে তরুণ অরুণ
দলে দলে দিল দেখা,
ফাঁসির মঞ্চে জ্বলে নিভে গেল
কত জীবনের শিখা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানে মুক্ত হাওয়ায় বেশ কিছুদিন ভাল ছিলেন। কিন্তু শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গলার ক্ষত আবার বেড়ে উঠল। নিয়মিত আহার গ্রহণ তখন তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ; তাই দেহ অতি ক্ষীণ কঙ্কালসার। দেখে সবার মনেই দিনের পর দিন ঘনীভূত হল আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার কাল ছায়া। কিন্তু ঠাকুরের সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। শুয়ে থেকে যাকে কাছে দেখেন তাকেই ডেকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করেন, আবার নাম ধরে ধরে সকলকে কাছে ডেকে বলেন, 'তোদের সবার মনস্কামনা মা পূর্ণ করবেন'। জীবন-দীপের তেল প্রায় যখন একেবারে নিঃশেষ—শেষ নির্বাণের তিন চার দিন মাত্র পূর্বে নরেনকে শয্যাপার্শ্বে ডেকে এনে বললেন, 'দরজার খিলটা ভাল করে আটকে দে, তারপর আমার কাছে এসে বোস্'। শয্যার অতি কাছে নরেন আসন করে বসলেন। নরেনের দিকে তাকিয়ে থেকে ঠাকুরের দু'চোখে জলের ধারা এল, মুছে ফেলে এক দৃষ্টিতে আবার নরেনের দিকে তাকিয়ে থেকে সমাধিস্থ হলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ, সম্মুখে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলেন নরেন্দ্রনাথ। একটু পরে ঠাকুর ভাব কাটিয়ে উঠে নরেনকে স্পর্শ করলেন। নরেনের সর্বদেহে সহসা যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সাথে সাথে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'আমার যা কিছু ছিল, সর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির সেজে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। এ শক্তি তোতে সক্রিয় হয়ে জগতে অসাধ্য সাধন করবে। আবার তোর করণীয় যা যা কাজ সাঙ্গ হলে তুইও চলে যাবি তোর যথাস্থানে। আমাকে আশ্রয় করে যারা

নিজেদের গড়ে তুলেছে তাদের সবরকম দেখাশুনার ভার তোকে দিয়ে গেলাম।'

এবার আমায় দাও গো বিদায়
সাঙ্গ ভবের সব খেলা।
ডাক দিয়েছে পারের বাঁশি
ওপার যাব নাই বেলা॥
যে ধন পেলাম মাকে পূজি
ভবের মাঝে রইল পুঁজি ;
মার দেওয়া ধন, রতনরাজি
সোনা চাঁদির নয় ঢেলা॥
এ ধন, তত্ত্বজ্ঞানের অমৃত সার
পান করিলে রয় না বিকার,
কালসাগরের প্রেমতুফানে
আপনি ভেসে যায় ভেলা॥

এরপর একদিন গিরিশ ও কাশীপুরের ভক্তসঙ্ঘ 'জয়কালী জয়কালী' বলে ঠাকুরের পায়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন। সারদামণি ভয়ে ভয়ে নিরালায় একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি একলা আমাকে ফেলে চলে যাবে? কার কাছে আমি থাকব?' উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'এই যে এতগুলো ছেলে, এরা সব তোমার। আরও কত আসবে! আর চলার সোজা রাস্তা—সে তো তোমাকে অনেক আগেই দেখিয়ে দিয়েছি।'

কিছুদিন ধরে কলকাতা, বরাহনগর, কাশীপুর ও দক্ষিণেশ্বরে দুশ্চিন্তা ও বিষাদের কাল মেঘ সকলের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। সর্বদা সর্বত্র সকলের কানে যেন বেজে ওঠে বাতাসের ঘন ঘন সকরুণ দীর্ঘশ্বাস। এরপর এল ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। বাংলা ৩১শে

শ্রাবণ, রাত্রি এক ঘটিকা। মাত্র দু'একবার মুখে কালী কালী বলে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হলেন। এই মহাসমাধি আর ভাঙ্গল না। এই অবস্থাতেই তাঁর চিরপবিত্র অমর আত্মা পরমব্রহ্মে মিলিয়ে গেল।

১লা ভাদ্র অতি প্রত্যুষেই সংবাদ সকলের মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। সাথে সাথে শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ ছাড়াও বাগানবাড়ীর চারদিকে লোকে লোকারণ্য। হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্তি-বিগলিত চিত্তে মরদেহ পুষ্পমাল্য ও চন্দনে অতি যত্নে সাজিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন। অশ্রুসিক্ত চোখে পাদ স্পর্শ করে ভক্তেরা একে একে গুরুকে নিবেদন করলেন শেষ প্রণাম। শ্মশানযাত্রার পূর্বে সর্বাগ্রে সাজান হল একটি একটি করে ধর্মীয় প্রতীক পতাকাগুলি। তাতে অঙ্কিত ছিল হিন্দুদের ওঁকার ও ত্রিশূল, খ্রীস্টানদের 'ক্রশ', মুসলমানদের অর্ধচন্দ্র ও তারা, বৌদ্ধদের খুস্তি আর পিছনে বিরাট সংকীর্তনের দল। যুগাবতার, অমরাত্মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মরদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হতে চলেছে। অগ্রগামী মিলিত পতাকা-মিছিল যেন জগতের কানে আর একবার ঢেলে রেখে গেল এই মহাসাধকের হৃদয়বেদের উদ্গীত পরমসত্য—'যত মত তত পথ'। সবাইকে ডেকে যেন চীৎকার করে বলছে—

'হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, মুসলিম, খৃস্টান,
সকলের মাঝে মিলেছেন যিনি তিনি এক ভগবান।'

তাঁর অমর আত্মার কাছে আজ হক সকলের কাতর প্রার্থনা—আত্মঘাতী রাজনীতি ও ধর্মীয় বিবাদে রক্তগঙ্গার বানে দেশ যেন আর ভেসে না যায়।

ওরে হৃদয়পুরের অন্ধকারে
লুকিয়ে আছে আপন জন
খুঁজে তারে দেখ না অবোধ মন।

নাই তার জাতবিচার আর ভেদাভেদ জ্ঞান,
সকল দেখে একই সমান ;
হিন্দু মুসলমান আর খৃস্টান
(তার) কেউ নয় পর, সব আপন
খুঁজে তারে দেখ না অবোধ মন ॥
চতুর্বেদ পুরাণ আর বাইবেল কোরান
ধ্যান করে তার পেয়েছে জ্ঞান
চলরে যে যার মতে জীবনপথে
দেখবি লাভ হবে সেই পরমধন ;
খুঁজে তারে দেখ না অবোধ মন ॥

ঘাটে পৌছে মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে শ্মশানে ভস্ম হয়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেল তাঁর মরদেহ। আর অনন্তকালের জন্য রয়ে গেল জগতে জ্যোতির্ময় অবিনশ্বর তাঁর আত্মার দ্যুতি। বিবিধ পুস্তক-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে রইল অমৃতময় বাণীরূপে অসংখ্য রত্নাবলী—যা অনন্ত যুগ ধরে পৃথিবীর পথভ্রান্ত পথিকদের আলোর বর্তিকা হয়ে সত্য পথের সন্ধান দেবে।

ফিরে এস তপোধন,
কাঙালের ডাকে এস, ফিরে এস
কাঙালের নারায়ণ।
হে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু,
কাণ্ডারী এ ধরার,
যত মত তত দেখাইলে পথ
ঘুচায়ে অন্ধকার ;
কহিলে ডাকিয়া এক ভগবান,
মাতাপিতা ভবে সবে সন্তান,

তবু কেন এত শত ব্যবধান,
বলিদান নিপীড়ন ॥

হাসে সন্ত্রাস আকাশে বাতাসে
পাতিয়া মৃত্যু-ফাঁদ,
তোমার সৃষ্টি কাঁদিছে ক্ষুধায়
ধ্বনিয়া আর্তনাদ ;
কঙ্কালসার ভুখা জনতার
হৃদয় বিদারি ওঠে হাহাকার,
নাই যার কোন সম্বল তার
কে ঘুচাবে এ বেদন ?
কাঁদিছে পতিত চির অসহায়
জীবনে সর্বহারা,
তোমার আশিস বিবেকের বাণী
তারে কি দিবে না সাড়া ?
লুটায় পাতকী পথের ধূলায়,
ও পদ সেবায় জুড়াইতে চায়,
এস অনাথের করিতে মোচন
বাধাভয়বন্ধন ॥

———